আটটি গল্প

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

মূল্য বারো আনা

নিবেদন

ছেলেদের পাঠ্যপুস্তকরূপে গল্পের বইয়ের বিশেষ প্রয়োজন আছে ইহা আমরা অনুভব করিয়াছি। সেই জন্যই "গল্পগুচ্ছ" হইতে বালকবালিকাদের পাঠোপযোগী আটটি গল্প নির্ব্বাচন করিয়া লইয়া এই গ্রন্থখানি সঙ্কলন করা হইল।

সূচী

খোকাবাবু

প্রথম পরিচ্ছেদ।

রাইচরণ যখন বাবুদের বাড়ি প্রথম চাকরী করিতে আসে তখন তাহাব বয়স বারো। যশোহর জিলায় বাড়ি। লম্বা চুল, বড় বড় চোখ, শ্যামচিক্কণ ছিপছিপে বালক। জাতিতে কায়স্থ। তাহার প্রভুরাও কায়স্থ। বাবুদের এক বৎসর বয়স্ক একটি শিশুর রক্ষণ ও পালনকার্য্যে সহায়তা করা তাহার প্রধান কর্ত্তব্য ছিল।

সেই শিশুটি কালক্রমে রাইচরণের কক্ষ ছাড়িয়া স্কুলে, স্কুল ছাড়িয়া কলেজে, অবশেষে কলেজ ছাড়িয়া মুন্সেফিতে প্রবেশ করিয়াছেন। রাইচরণ এখনো তাঁহার ভৃত্য।

তাহার আর একটি মনিব বাড়িয়াছে, মাঠাকুরাণী ঘরে আসিয়াছেন; সুতরাং অনুকূল বাবুর উপর রাইচরণের পূর্ব্বে যতটা অধিকার ছিল তাহার অধিকাংশই নূতন কর্ত্রীর হস্তগত হইয়াছে।

কিন্তু কর্ত্রী যেমন রাইচরণের পূর্ব্বাধিকার কতকটা হ্রাস করিয়া লইয়াছেন তেমনি একটি নূতন অধিকার দিয়া অনেকটা পূরণ করিয়া দিয়াছেন। অনুকূলের একটি পুত্রসন্তান অল্পদিন

হইল জন্মলাভ করিয়াছে—এবং রাইচরণ কেবল নিজের চেষ্টা ও অধ্যবসায়ে তাহাকে সম্পূর্ণরূপে আয়ত্ত করিয়া লইয়াছে।

তাহাকে এমনি উৎসাহের সহিত দোলাইতে আরম্ভ করিয়াছে, এমনি নিপুণতার সহিত তাহাকে দুই হাতে ধরিয়া আকাশে উৎক্ষিপ্ত করে, তাহাব মুখের কাছে আসিয়া এমনি সশব্দে শিরশ্চালন করিতে থাকে, উত্তরের কোন প্রত্যাশা না করিয়া এমন সকল সম্পূর্ণ অর্থহীন অসঙ্গত প্রশ্ন সুর করিয়া শিশুর প্রতি প্রয়োগ করিতে থাকে যে এই ক্ষুদ্র আনুকৌলবটি রাইচরণকে দেখিলে একেবারে পুলকিত হইয়া উঠে।

অবশেষে ছেলেটি যখন হামাগুড়ি দিয়া অতি সাবধানে চৌকাট পার হইত, এবং কেহ ধরিতে আসিলে খিল্ খিল্ হাস্য কলরব তুলিয়া দ্রুতবেগে নিরাপদ স্থানে লুকাইতে চেষ্টা করিত, তখন রাইচরণ তাহাব অসাধারণ চাতুর্য্য ও বিচারশক্তি দেখিয়া চমৎকৃত হইয়া যাইত। মার কাছে গিয়া সগর্ব্বে সবিস্ময়ে বলিত, "মা, তোমার ছেলে বড় হ'লে জজ্ হবে, পাঁচ হাজার টাকা রোজগার করবে।"

পৃথিবীতে আর কোন মানবসন্তান যে এই বয়সে চৌকাট লঙ্ঘন প্রভৃতি অসম্ভব চাতুর্য্যের পরিচয় দিতে পারে তাহা বাইচরণের ধ্যানের অগম্য, কেবল ভবিষ্যৎ জজ্দের পক্ষে কিছুই আশ্চর্য্য নহে।

অবশেষে শিশু যখন টলমল করিয়া চলিতে আরম্ভ করিল সে এক আশ্চর্য্য ব্যাপার, এবং যখন মাকে মা, পিসিকে পিচি, এবং রাইচরণকে চন্ন বলিয়া সম্ভাষণ করিল, তখন রাইচরণ সেই প্রত্যয়াতীত সংবাদ যাহার তাহার কাছে ঘোষণা করিতে লাগিল।

সব চেয়ে আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, "মাকে মা বলে, পিসিকে পিসি বলে, কিন্তু আমাকে বলে চন্ন!" বাস্তবিক শিশুর মাথায় এ বুদ্ধি কি করিয়া যোগাইল বলা শক্ত। নিশ্চয়ই কোন বয়স্ক লোক কখনই এরূপ অলোকসামান্যতার পরিচয় দিত না, এবং দিলেও তাহার জজের পদপ্রাপ্তি সম্ভাবনা সম্বন্ধে সাধারণের সম্পূর্ণ সন্দেহ উপস্থিত হইত।

কিছুদিন বাদে মুখে দড়ি দিয়া রাইচরণকে ঘোড়া সাজিতে হইল। মল্ল সাজিয়া তাহাকে শিশুর সহিত কুস্তি করিতে হইত—আবার পরাভূত হইয়া ভূমিতে পড়িয়া না গেলে বিষম বিপ্লব বাধিত। এই সময়ে অনুকূল পদ্মাতীরবর্ত্তী এক জিলায় বদলী হইলেন।

অনুকূল তাঁহার শিশুর জন্য কলিকাতা হইতে এক ঠেলাগাড়ি লইয়া গেলেন। সাটিনের জামা এবং মাথায় একটা জরির টুপি, হাতে সোনার বালা এবং পায়ে দুইগাছি মল পরাইয়া রাইচরণ নবকুমারকে দুই বেলা গাড়ি করিয়া হাওয়া খাওয়াইতে লইয়া যাইত।

বর্ষাকাল আসিল। ক্ষুধিত পদ্মা উদ্যান গ্রাম শস্যক্ষেত্র এক এক গ্রাসে মুখে পুরিতে লাগিল। বালুকাচরের কাশবন এবং বনঝাউ জলে ডুবিয়া গেল। পাড় ভাঙার অবিশ্রাম ঝুপ্‌ঝুপ্‌ শব্দ এবং জলের গর্জ্জনে দশদিক মুখরিত হইয়া উঠিল, এবং দ্রুতবেগে ধাবমান ফেনরাশি নদীর তীব্রগতিকে প্রত্যক্ষগোচর করিয়া তুলিল।

অপরাহ্ণে মেঘ করিয়াছিল, কিন্তু বৃষ্টির কোন সম্ভাবনা ছিল না। রাইচরণের খামখেয়ালি ক্ষুদ্র প্রভু কিছুতেই ঘরে থাকিতে

চাহিল না। গাড়ির উপর চড়িয়া বসিল। রাইচরণ ধীরে ধীরে গাড়ি ঠেলিয়া ধান্যক্ষেত্রের প্রান্তে নদীর তীরে আসিয়া উপস্থিত হইল। নদীতে একটিও নৌকা নাই, মাঠে একটিও লোক নাই—মেঘের ছিদ্র দিয়া দেখা গেল, পরপারে জনহীন বালুকা-তীরে শব্দহীন দীপ্ত সমারোহের সহিত সূর্য্যাস্তের আয়োজন হইতেছে। সেই নিস্তব্ধতার মধ্যে শিশু সহসা একদিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া বলিল, "চন্ন, ফু!"

অনতিদূরে সজল পঙ্কিল ভূমির উপর একটি বৃহৎ কদম্ববৃক্ষের উচ্চশাখায় গুটিকতক কদম্ব-ফুল ফুটিয়াছিল, সেই দিকে শিশুর লুব্ধ দৃষ্টি আকৃষ্ট হইয়াছিল। দুই-চারি দিন হইল রাইচরণ কাঠি দিয়া বিদ্ধ করিয়া তাহাকে কদম্ব-ফুলের গাড়ি বানাইয়া দিয়াছিল, তাহাতে দড়ি বাঁধিয়া টানিতে শিশুর এত আনন্দ বোধ হইয়াছিল যে সেদিন রাইচরণকে আর লাগাম পরিতে হয় নাই; ঘোড়া হইতে সে একেবারেই সহিসের পদে উন্নীত হইয়াছিল।

কাদা ভাঙিয়া ফুল তুলিতে যাইতে চন্নর প্রবৃত্তি হইল না—তাড়াতাড়ি বিপরীত দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া বলিল, "দেখ দেখ ও—ই দেখ পাখী—ওই উড়ে—এ গেল! আয়রে পাখী আয় আয়"—এইরূপ অবিশ্রান্ত বিচিত্র কলরব করিতে করিতে সবেগে গাড়ি ঠেলিতে লাগিল।

কিন্তু যে ছেলের ভবিষ্যতে জজ হইবার কোন সম্ভাবনা আছে, তাহাকে এরূপ সামান্য উপায়ে ভুলাইবার প্রত্যাশা করা বৃথা—বিশেষতঃ চারিদিকে দৃষ্টি আকর্ষণের উপযোগী কিছুই ছিল না এবং কাল্পনিক পাখী লইয়া অধিকক্ষণ কাজ চলে না।

রাইচরণ বলিল, "তবে তুমি গাড়িতে বসে থাক, আমি চট্ করে ফুল তুলে আন্‌চি। খবরদার জলের ধারে যেয়ো না।" বলিয়া হাঁটুর উপর কাপড় তুলিয়া কদম্ব-বৃক্ষের অভিমুখে চলিল।

কিন্তু ঐ যে জলের ধারে যাইতে নিষেধ করিয়া গেল, তাহাতে শিশুর মন কদম্ব-ফুল হইতে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া সেই মুহূর্তেই জলের দিকে ধাবিত হইল। দেখিল, জল খল্‌খল্ ছল্‌ছল্ করিয়া ছুটিয়া চলিয়াছে; যেন দুষ্টামি করিয়া কোন্ এক বৃহৎ রাইচরণের হাত এড়াইয়া এক লক্ষ শিশুপ্রবাহ সহাস্য কলস্বরে নিষিদ্ধ স্থানাভিমুখে দ্রুতবেগে পলায়ন করিতেছে।

তাহাদের সেই অসাধু দৃষ্টান্তে মানবশিশুর চিত্ত চঞ্চল হইয়া উঠিল। গাড়ি হইতে আস্তে আস্তে নামিয়া জলের ধারে গেল—একটা দীর্ঘ তৃণ কুড়াইয়া লইয়া তাহাকে ছিপ কল্পনা করিয়া ঝুঁকিয়া মাছ ধরিতে লাগিল—দুরন্ত জলরাশি অস্ফুট কলভাষায় শিশুকে বারবার আপনাদের খেলাঘরে আহ্বান করিল।

একবার ঝপ্ করিয়া একটা শব্দ হইল, কিন্তু বর্ষার পদ্মাতীরে এমন শব্দ কত শোনা যায়! রাইচরণ আঁচল ভরিয়া কদম্ব-ফুল তুলিল। গাছ হইতে নামিয়া সহাস্যমুখে গাড়ির কাছে আসিয়া দেখিল কেহ নাই। চারিদিকে চাহিয়া দেখিল কোথাও কাহারও কোন চিহ্ন নাই।

মুহূর্তে রাইচরণের শরীরের রক্ত হিম হইয়া গেল। সমস্ত জগৎসংসার মলিন বিবর্ণ ধোঁয়ার মত হইয়া আসিল। ভাঙা-বুকের মধ্য হইতে একবার প্রাণপণ চীৎকার করিয়া ডাকিয়া উঠিল, "বাবু—খোকাবাবু, লক্ষ্মি, দাদাবাবু আমার!"

কিন্তু চন্ন বলিয়া কেহ উত্তর দিল না, দুষ্টামি করিয়া কোন শিশুর কণ্ঠ হাসিয়া উঠিল না; কেবল পদ্মা পূর্ব্ববৎ ছল্‌ছল্ খল্‌খল্ করিয়া ছুটিয়া চলিতে লাগিল, যেন সে কিছুই জানে না, এবং পৃথিবীর এই সকল সামান্য ঘটনায় মনোযোগ দিতে তাহার যেন এক মুহূর্ত্ত সময় নাই।

সন্ধ্যা হইয়া আসিলে উৎকণ্ঠিত জননী চারিদিকে লোক পাঠাইয়া দিলেন। লণ্ঠন হাতে নদীতীরে লোক আসিয়া দেখিল রাইচরণ নিশীথের ঝোড়ো বাতাসের মত সমস্ত ক্ষেত্রময় "বাবু, খোকাবাবু আমার" বলিয়া ভগ্নকণ্ঠে চীৎকার করিয়া বেড়াইতেছে। অবশেষে ঘরে ফিরিয়া রাইচরণ দড়াম্ করিয়া মাঠাকরুণের পায়ের কাছে আসিয়া আছাড় খাইয়া পড়িল। তাহাকে যত জিজ্ঞাসা করে সে কাঁদিয়া বলে, "জানিনে মা!"

যদিও সকলেই মনে মনে বুঝিল পদ্মারই এই কাজ, তথাপি গ্রামের প্রান্তে যে এক দল বেদের সমাগম হইয়াছে তাহাদের প্রতিও সন্দেহ দূর হইল না। এবং মাঠাকুরাণীর মনে এমন সন্দেহ উপস্থিত হইল যে রাইচরণই বা চুরি করিয়াছে; এমন কি, তাহাকে ডাকিয়া অত্যন্ত অনুনয়পূর্ব্বক বলিলেন, "তুই আমার বাছাকে ফিরিয়ে এনে দে—তুই যত টাকা চাস্ তোকে দেব।" শুনিয়া রাইচরণ কেবল কপালে করাঘাত করিল। গৃহিণী তাহাকে দূর করিয়া তাড়াইয়া দিলেন।

অনুকূল বাবু তাঁহার স্ত্রীর মন হইতে রাইচরণের প্রতি এই অন্যায় সন্দেহ দূর করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন; জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন রাইচরণ এমন জঘন্য কাজ কি উদ্দেশ্যে করিতে পারে! গৃহিণী বলিলেন, "কেন? তাহার গায়ে সোনার গহনা ছিল।"

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

রাইচরণ দেশে ফিরিয়া গেল। এতকাল তাহার সন্তানাদি হয় নাই, হইবার বিশেষ আশাও ছিল না। কিন্তু দৈবক্রমে, বৎসর না যাইতেই তাহার স্ত্রী অধিক বয়সে একটি পুত্রসন্তান প্রসব করিয়া লোকলীলা সম্বরণ করিল।

এই নবজাত শিশুটির প্রতি রাইচরণের অত্যন্ত বিদ্বেষ জন্মিল। মনে করিল, এ যেন ছল করিয়া খোকাবাবুর স্থান অধিকার করিতে আসিয়াছে। মনে করিল, প্রভুর এক মাত্র ছেলেটি জলে ভাসাইয়া নিজে পুত্রসুখ উপভোগ করা যেন একটি মহাপাতক। রাইচরণের বিধবা ভগ্নী যদি না থাকিত তবে এ শিশুটি পৃথিবীর বায়ু বেশি দিন ভোগ করিতে পাইত না।

আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, এই ছেলেটিও কিছুদিন বাদে চৌকাট পার হইতে আরম্ভ করিল, এবং সর্ব্বপ্রকার নিষেধ লঙ্ঘন করিতে সকৌতুক চতুরতা প্রকাশ করিতে লাগিল। এমন কি, ইহার কণ্ঠস্বর হাস্যক্রন্দনধ্বনি অনেকটা সেই শিশুরই মত। এক-একদিন যখন ইহার কান্না শুনিত রাই-চরণের বুকটা সহসা ধড়াস্ করিয়া উঠিত, মনে হইত দাদাবাবু রাইচরণকে হারাইয়া কোথায় কাঁদিতেছে।

ফেল্‌না—রাইচরণের ভগ্নী ইহার নাম রাখিয়াছিল ফেল্‌না—যথা সময়ে পিসিকে পিসি বলিয়া ডাকিল। সেই পরিচিত ডাক শুনিয়া একদিন হঠাৎ রাইচরণের মনে হইল—

তবে ত খোকাবাবু আমার মায়া ছাড়িতে পারে নাই। সে ত আমার ঘরে আসিয়াই জন্মগ্রহণ করিয়াছে।

এই বিশ্বাসের অনুকূলে কতকগুলি অকাট্য যুক্তি ছিল। প্রথমত, সে যাইবার অনতিবিলম্বেই ইহার জন্ম। দ্বিতীয়ত, এতকাল পরে সহসা যে তাহার স্ত্রীর গর্ভে সন্তান জন্মে এ কখনই স্ত্রীর নিজগুণে হইতে পারে না। তৃতীয়ত, এও হামাগুড়ি দেয়, টলমল্ করিয়া চলে, এবং পিসিকে পিসি বলে! যে সকল লক্ষণ থাকিলে ভবিষ্যতে জজ্ হইবার কথা, তাহার অনেকগুলি ইহাতে বর্ত্তিয়াছে।

তখন মাঠাকরুণের সেই দারুণ সন্দেহের কথা হঠাৎ মনে পড়িল—আশ্চর্য্য হইয়া মনে মনে কহিল, "আহা, মায়ের মন জানিতে পারিয়াছিল তাহার ছেলেকে কে চুরি করিয়াছে!"—তখন, এতদিন শিশুকে যে অযত্ন করিয়াছে, সেজন্য বড় অনুতাপ উপস্থিত হইল। শিশুর কাছে আবার ধরা দিল।

এখন হইতে ফেল্‌নাকে রাইচরণ এমন করিয়া মানুষ করিতে লাগিল যেন সে বড় ঘরের ছেলে। সাটিনের জামা কিনিয়া দিল। জরির টুপি আনিল। মৃত স্ত্রীর গহনা গলাইয়া চুড়ি এবং বালা তৈয়ারি হইল। পাড়ার কোন ছেলের সহিত তাহাকে খেলিতে দিত না—রাত্রিদিন নিজেই তাহার একমাত্র খেলার সঙ্গী হইল। পাড়ার ছেলেরা সুযোগ পাইলে তাহাকে নবাবপুত্র বলিয়া উপহাস করিত এবং দেশের লোক রাইচরণের এইরূপ উন্মত্তবৎ আচরণে আশ্চর্য্য হইয়া গেল।

ফেল্‌নার যখন বিদ্যাভ্যাসের বয়স হইল তখন রাইচরণ নিজের জোতজমা সমস্ত বিক্রয় করিয়া ছেলেটিকে কলিকাতায়

লইয়া গেল। সেখানে বহুকষ্টে একটি চাকরীর জোগাড় করিয়া ফেল্‌নাকে বিদ্যালয়ে পাঠাইল। নিজে যেমন তেমন করিয়া থাকিয়া ছেলেকে ভাল খাওয়া, ভাল পরা, ভাল শিক্ষা দিতে ক্রুটি করিত না। মনে মনে বলিত, বৎস, ভালবাসিয়া আমার ঘরে আসিয়াছ বলিয়া যে তোমার কোন অযত্ন হইবে, তা হইবে না।

এম্‌নি করিয়া বারো বৎসর কাটিয়া গেল, ছেলে পড়ে শুনে ভাল, এবং দেখিতে শুনিতেও বেশ, হৃষ্টপুষ্ট উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ— কেশবেশ-বিন্যাসের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি, মেজাজ্ কিছু সুখী এবং সৌখীন। বাপকে ঠিক বাপের মত মনে করিতে পারিত না। কারণ, রাইচরণ স্নেহে বাপ, সেবায় ভৃত্য ছিল, এবং তাহার আর একটি দোষ ছিল, সে যে ফেল্‌নার বাপ এ কথা সকলের কাছেই গোপন রাখিয়াছিল। যে ছাত্রনিবাসে ফেল্‌না বাস করিত সেখানকার ছাত্রগণ বাঙাল রাইচরণকে লইয়া সর্ব্বদা কৌতুক করিত, এবং পিতার অসাক্ষাতে ফেল্‌নাও যে সেই কৌতুকালাপে যোগ দিত না তাহা বলিতে পারি না। অথচ নিরীহ বৎসল স্বভাব রাইচরণকে সকল ছাত্রই বড় ভালবাসিত, এবং ফেল্‌নাও ভালবাসিত, কিন্তু পূর্ব্বেই বলিয়াছি ঠিক বাপের মত নহে, তাহাতে কিঞ্চিৎ অনুগ্রহ মিশ্রিত ছিল।

রাইচরণ বৃদ্ধ হইয়া আসিয়াছে। তাহার প্রভু কাজ কর্ম্মে সর্ব্বদাই দোষ ধরে। বাস্তবিক তাহার শরীরও শিথিল হইয়া আসিয়াছে কাজেও তেমন মন দিতে পারে না, কেবলি ভুলিয়া যায়—কিন্তু যে ব্যক্তি পূরা বেতন দেয় বার্দ্ধক্যের ওজর সে মানিতে চাহে না। এদিকে রাইচরণ বিষয় বিক্রয় করিয়া যে

নগদ টাকা সংগ্রহ করিয়া আনিয়াছিল তাহাও নিঃশেষ হইয়া আসিয়াছে। ফেল্‌না আজ-কাল বসনভূষণের অভাব লইয়া সর্ব্বদা খুঁৎখুঁৎ করিতে আরম্ভ করিয়াছে।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

একদিন রাইচরণ হঠাৎ কর্ম্মে জবাব দিল এবং ফেল্‌নাকে কিছু টাকা দিয়া বলিল,—আবশ্যক পড়িয়াছে, আমি কিছু দিনের মত দেশে যাইতেছি। এই বলিয়া বারাসতে গিয়া উপস্থিত হইল। অনুকূল বাবু তখন সেখানে মুন্সেফ ছিলেন।

অনুকূলের আর দ্বিতীয় সন্তান হয় নাই, গৃহিণী এখনো সেই পুত্রশোক বক্ষের মধ্যে লালন করিতেছিলেন।

একদিন সন্ধ্যার সময় বাবু কাছারি হইতে আসিয়া বিশ্রাম করিতেছেন এবং কর্ত্রী একটি সন্ন্যাসীর নিকট হইতে সন্তান কামনায় বহুমূল্যে একটি শিকড় ও আশীর্ব্বাদ কিনিতেছেন—এমন সময় প্রাঙ্গণে শব্দ উঠিল—"জয় হোক মা!"

বাবু জিজ্ঞাসা করিলেন—"কে রে?"

রাইচরণ আসিয়া প্রণাম করিয়া বলিল,—"আমি রাইচরণ।"

বৃদ্ধকে দেখিয়া অনুকূলের হৃদয় আর্দ্র হইয়া উঠিল। তাহার বর্ত্তমান অবস্থা সম্বন্ধে সহস্র প্রশ্ন এবং আবার তাহাকে কর্ম্মে নিয়োগ করিবার প্রস্তাব করিলেন।

রাইচরণ ম্লান হাস্য করিয়া কহিল,—"মাঠাকরুণকে একবার প্রণাম করিতে চাই।"

অনুকূল তাহাকে সঙ্গে করিয়া অন্তঃপুরে লইয়া গেলেন। মাঠাকরুণ রাইচরণকে তেমন প্রসন্নভাবে সমাদর করিলেন না—রাইচরণ তৎপ্রতি লক্ষ্য না করিয়া যোড়হস্তে কহিল—"প্রভু, মা, আমিই তোমাদের ছেলেকে চুরি করিয়া লইয়াছিলাম। পদ্মাও নয়, আর কেহও নয়, কৃতঘ্ন অধম এই আমি"—

অনুকূল বলিয়া উঠিলেন,—"বলিস্ কিরে! কোথায় সে!"

"আজ্ঞা, আমার কাছেই আছে, আমি পরশ্ব আনিয়া দিব।"

সেদিন রবিবার। কাছারি নাই। প্রাতঃকাল হইতে স্ত্রী পুরুষে দুইজনে উন্মুখভাবে পথ চাহিয়া বসিয়া আছেন। দশটার সময় ফেল্‌নাকে সঙ্গে লইয়া রাইচরণ উপস্থিত হইল।

অনুকূলের স্ত্রী কোন প্রশ্ন কোন বিচার না করিয়া তাহাকে কোলে বসাইয়া, তাহাকে স্পর্শ করিয়া, তাহার আঘ্রাণ লইয়া, অতৃপ্ত নয়নে তাহার মুখ নিরীক্ষণ করিয়া কাঁদিয়া হাসিয়া ব্যাকুল হইয়া উঠিলেন। বাস্তবিক, ছেলেটি দেখিতে বেশ—বেশভূষা আকার প্রকারে দারিদ্র্যের কোন লক্ষণ নাই। মুখে অত্যন্ত প্রিয়দর্শন বিনীত সলজ্জ ভাব দেখিয়া অনুকূলের হৃদয়েও সহসা স্নেহ উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল।

তথাপি তিনি অবিচলিত ভাব ধারণ করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"কোন প্রমাণ আছে?"

রাইচরণ কহিল—"এমন কাজের প্রমাণ কি করিয়া থাকিবে? আমি যে তোমার ছেলে চুরি করিয়াছিলাম সে কেবল ভগবান জানেন, পৃথিবীতে আর কেহ জানে না।"

অনুকূল ভাবিয়া স্থির করিলেন যে, ছেলেটিকে পাইবামাত্র তাঁহার স্ত্রী যেরূপ আগ্রহের সহিত তাহাকে আগলাইয়া ধরিয়াছেন

এখন প্রমাণ সংগ্রহের চেষ্টা করা সুযুক্তি নহে; যেমন হউক, বিশ্বাস করাই ভাল। তা ছাড়া, রাইচরণ এমন ছেলেই বা কোথায় পাইবে? এবং বৃদ্ধ ভৃত্য তাঁহাকে অকারণে প্রতারণাই বা কেন করিবে?—

ছেলেটির সহিতও কথোপকথন করিয়া জানিলেন যে, সে শিশুকাল হইতে রাইচরণের সহিত আছে এবং রাইচরণকে সে পিতা বলিয়া জানিত, কিন্তু রাইচরণ কখনও তাহার প্রতি পিতার ন্যায় ব্যবহার করে নাই, অনেকটা ভৃত্যের ভাব ছিল।

অনুকূল মন হইতে সন্দেহ দূর করিয়া বলিলেন—"কিন্তু রাইচরণ, তুই আর আমাদের ছায়া মাড়াইতে পাইবি না।"

রাইচরণ করযোড়ে গদ্গদ কণ্ঠে বলিল,—"প্রভু, বৃদ্ধবয়সে কোথায় যাইব!"

কর্ত্রী বলিলেন, "আহা থাক্! আমার বাছার কল্যাণ হোক্! ওকে আমি মাপ করিলাম।"

ন্যায়পরায়ণ অনুকূল কহিলেন, "যে কাজ করিয়াছে উহাকে মাপ করা যায় না।"

রাইচরণ অনুকূলের পা জড়াইয়া কহিল, "আমি করি নাই, ঈশ্বর করিয়াছেন।"

নিজের পাপ ঈশ্বরের স্কন্ধে চাপাইবার চেষ্টা দেখিয়া অনুকূল আরো বিরক্ত হইয়া কহিলেন, "যে এমন বিশ্বাসঘাতকতার কাজ করিয়াছে তাহাকে আর বিশ্বাস করা কর্ত্তব্য নয়।"

রাইচরণ প্রভুর পা ছাড়িয়া কহিল, "সে আমি নয় প্রভু!"

"তবে কে?"

"আমার অদৃষ্ট!"

কিন্তু এরূপ কৈফিয়তে কোন শিক্ষিত লোকের সন্তোষ হইতে পারে না।

ফেল্‌না যখন দেখিল সে মুন্সেফের সন্তান, রাইচরণ তাহাকে এতদিন চুরি করিয়া নিজের ছেলে বলিয়া আপমানিত করিয়াছে তখন তাহার মনে মনে কিছু রাগ হইল। কিন্তু তথাপি উদারভাবে পিতাকে বলিল, "বাবা উহাকে মাপ কর। বাড়িতে থাকিতে না দাও, উহার মাসিক কিছু টাকা বরাদ্দ করিয়া দাও।"

ইহার পর রাইচরণ কোন কথা না বলিয়া একবার পুত্রের মুখ নিরীক্ষণ করিল, সকলকে প্রণাম করিল; তাহার পর দ্বারের বাহির হইয়া পৃথিবীর অগণ্য লোকের মধ্যে মিশিয়া গেল। মাসান্তে অনুকূল যখন তাহার দেশের ঠিকানায় কিঞ্চিৎ বৃত্তি পাঠাইলেন তখন সে টাকা ফিরিয়া আসিল। সেখানে কোন লোক নাই।

সাক্ষী।

ডাক্তার যখন জবাব দিয়া গেল তখন গুরুচরণের ভাই রামকানাই রোগীর পার্শ্বে বসিয়া ধীরে ধীরে কহিলেন, "দাদা, যদি তোমার উইল করিবার ইচ্ছা থাকে ত বল।" গুরুচরণ ক্ষীণস্বরে বলিলেন, "আমি বলি, তুমি লিখিয়া লও।" রামকানাই কাগজ কলম লইয়া প্রস্তুত হইলেন। গুরুচরণ বলিয়া গেলেন "আমার স্থাবর অস্থাবর সমস্ত বিষয় সম্পত্তি আমার ধর্ম্মপত্নী শ্রীমতী বরদাসুন্দরীকে দান করিলাম।" রামকানাই লিখিলেন—কিন্তু লিখিতে তাঁহার কলম সরিতেছিল না। তাঁহার বড় আশা ছিল, তাঁহার একমাত্র পুত্র নবদ্বীপ অপুত্রক জ্যাঠামহাশয়ের সমস্ত বিষয় সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হইবে। যদিও দুই ভাইয়ে পৃথগন্ন ছিলেন, তথাপি এই আশায় নবদ্বীপকে কিছুতেই তিনি চাকুরি করিতে দেন নাই—এবং সকাল সকাল বিবাহ দিয়াছিলেন, এবং শত্রুর মুখে ভস্ম নিক্ষেপ করিয়া বিবাহ নিষ্ফল হয় নাই। তথাপি রামকানাই লিখিলেন এবং সই করিবার জন্য কলমটা দাদার হাতে দিলেন। গুরুচরণ নির্জ্জীবহস্তে যাহা সই করিলেন, তাহা কতকগুলা কম্পিত বক্ররেখা কি তাঁহার নাম, বুঝা দুঃসাধ্য।

উইলের বৃত্তান্ত শুনিয়া নবদ্বীপের মা ছুটিয়া আসিয়া বিষম গোল বাধাইয়া দিল—বলিল—"মরণকালে বুদ্ধিনাশ হয়। এমন সোনারচাঁদ ভাইপো থাকিতে"—

রামকানাই ছুটিয়া আসিয়া বলিলেন, "মেজ বৌ, তোমার ত

বুদ্ধিনাশের সময় হয় নাই, তবে তোমার এমন ব্যবহার কেন? দাদা গেলেন, এখন আমি ত রহিয়া গেলাম, তোমার যা কিছু বক্তব্য আছে, অবসরমত আমাকে বলিয়ো, এখন ঠিক সময় নয়।—”

নবদ্বীপ সংবাদ পাইয়া যখন আসিল, তখন তাহার জ্যাঠা-মহাশয়ের কাল হইয়াছে। নবদ্বীপ মৃত ব্যক্তিকে শাসাইয়া কহিল, “দেখিব মুখাগ্নি কে করে—এবং শ্রাদ্ধশান্তি যদি করি ত আমার নাম নবদ্বীপ নয়।” গুরুচরণ লোকটা কিছুই মানিত না। সে ডফ সাহেবের ছাত্র ছিল। শাস্ত্রমতে যেটা সর্ব্বাপেক্ষা অখাদ্য সেইটাতে তার বিশেষ পরিতৃপ্তি। লোকে যদি তাহাকে ক্রীশ্চান বলিত, সে জিভ কাটিয়া বলিত, “রাম, আমি যদি ক্রীশ্চান হই ত গোমাংস খাই!” জীবিত অবস্থায় যাহার এই দশা, সদ্যোমৃত অবস্থায় সে যে পিণ্ডনাশ আশঙ্কায় কিছুমাত্র বিচলিত হইবে, এমন সম্ভাবনা নাই। কিন্তু উপস্থিত মত ইহা ছাড়া আর কোন প্রতিশোধের পথ ছিল না। নবদ্বীপ একটা সান্ত্বনা পাইল যে লোকটা পরকালে গিয়া মরিয়া থাকিবে। যতদিন ইহলোকে থাকা যায়, জ্যাঠামহাশয়ের বিষয় না পাইলেও কোনক্রমে পেট চলিয়া যায়, কিন্তু জ্যাঠামহাশয় যে লোকে গেলেন সেখানে ভিক্ষা করিয়া পিণ্ড মেলে না। বাঁচিয়া থাকিবার অনেক সুবিধা আছে।

রামকানাই বরদাসুন্দরীর নিকট গিয়া বলিলেন, “বৌ ঠাকুরাণি, দাদা তোমাকেই সমস্ত বিষয় দিয়া গিয়াছেন। এই তাহার উইল। লোহার সিন্দুকে যত্নপূর্ব্বক রাখিয়া দিয়ো।”

বাড়ি ফিরিয়া গিয়া নবদ্বীপের মা রামকানাইকে লইয়া

পড়িলেন। বোঝাই গাড়ি সমেত খাদের মধ্যে পড়িয়া হতভাগ্য বলদ গাড়োয়ানের সহস্র গুঁতা খাইয়াও অনেকক্ষণ যেমন নিরুপায় নিশ্চল ভাবে দাঁড়াইয়া থাকে, রামকানাই তেমনি অনেক্ষণ চুপ করিয়া সহ্য করিলেন—অবশেষে কাতরস্বরে কহিলেন, "আমার অপরাধ কি! আমি ত দাদা নই!"

নবদ্বীপের মা ফোঁস্ করিয়া উঠিয়া বলিলেন—"না, তুমি বড় ভাল মানুষ, তুমি কিছু বোঝো না; দাদা বল্লেন লেখ, ভাই অমনি লিখে গেলেন। তোমরা সবাই সমান।"

এদিকে নবদ্বীপ তাহার বুদ্ধিমান বন্ধুদের সহিত অনেক পরামর্শ করিয়া মাকে আসিয়া বলিল, "কোন ভাবনা নাই। এ বিষয় আমিই পাইব। কিছুদিনের মত বাবাকে এখান হইতে স্থানান্তরিত করা চাই। তিনি থাকিলে সমস্ত ভণ্ডুল হইয়া যাইবে।" নবদ্বীপের বাবার বুদ্ধিশুদ্ধির প্রতি নবদ্বীপের মার কিছুমাত্র শ্রদ্ধা ছিল না সুতরাং কথাটা তাঁরও যুক্তিযুক্ত মনে হইল। অবশেষে মার তাড়নায় এই নিতান্ত অনাবশ্যক নির্ব্বোধ কর্ম্মনাশা বাবা একটা যেমন-তেমন ছল করিয়া কিছুদিনের মত কাশীতে গিয়া আশ্রয় লইলেন।

অল্পদিনের মধ্যেই বরদাসুন্দরী এবং নবদ্বীপচন্দ্র পরস্পরের নামে উইল জালের অভিযোগ করিয়া আদালতে গিয়া উপস্থিত হইল। নবদ্বীপ তাহার নিজের নামে যে উইলখানি বাহির করিয়াছে তাহার নাম সহি দেখিলে গুরুচরণের হস্তাক্ষর স্পষ্ট প্রমাণ হয়; উইলের দুই একজন নিঃস্বার্থ সাক্ষীও পাওয়া গিয়াছে। বরদাসুন্দরীর পক্ষে নবদ্বীপের বাপ একমাত্র সাক্ষী এবং সহি কারো বুঝিবার সাধ্য নাই। তাঁহার গৃহপোষ্য একটী মামাতো ভাই

ছিল, সে বলিল, "দিদি তোমার ভাবনা নাই, আমি সাক্ষ্য দিব এবং আরও সাক্ষ্য জুটাইব।"

ব্যাপারটা যখন সম্পূর্ণ পাকিয়া উঠিল, তখন নবদ্বীপের মা নবদ্বীপের বাপকে কাশী হইতে ডাকিয়া পাঠাইলেন। অনুগত ভদ্রলোকটী ব্যাগ ও ছাতা হাতে যথাসময়ে আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

একদিন না যাইতেই রামকানাই সহসা আদালত হইতে এক সাক্ষীর সপিনা পাইলেন। অবাক্ হইয়া যখন তাহার মর্ম্মগ্রহণের চেষ্টা করিতেছেন তখন নবদ্বীপের মা আসিয়া কাঁদিয়া ভাসাইয়া দিলেন। বলিলেন, "হাড়জ্বালানী ডাকিনী কেবল যে বাছা নবদ্বীপকে তাহার স্নেহশীল জ্যাঠার ন্যায্য উত্তরাধিকার হইতে বঞ্চিত করিতে চায় তাহা নহে, আবার সোনার ছেলেকে জেলে পাঠাইবার আয়োজন করিতেছে।"

অবশেষে ক্রমে ক্রমে সমস্ত ব্যাপারটা অনুমান করিয়া লইয়া রামকানাইয়ের চক্ষু স্থির হইয়া গেল। উচ্চৈঃস্বরে বলিয়া উঠিলেন, "তোরা এ কি সর্ব্বনাশ করিয়াছিস্।" গৃহিণী ক্রমে নিজমূর্ত্তি ধারণ করিয়া বলিলেন—"কেন, এতে নবদ্বীপের দোষ হয়েচে কি? সে তার জ্যাঠার বিষয় নেবে না! অমনি এক কথায় ছেড়ে দেবে!"

হতবুদ্ধি রামকানাই যখন দেখিলেন, তাঁহার স্ত্রীপুত্র উভয়ে মিলিয়া কখন বা তর্জ্জন গর্জ্জন কখন বা অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন, তখন ললাটে করাঘাত করিয়া চুপ করিয়া বসিয়া রহিলেন—আহার ত্যাগ করিলেন, জল পর্য্যন্ত স্পর্শ করিলেন না।

এইরূপ দুই দিন নীরবে অনাহারে কাটিয়া গেল, মকদ্দমার

দিন উপস্থিত হইল। ইতিমধ্যে নবদ্বীপ বরদাসুন্দরীর মামাতো ভাইটিকে ভয় প্রলোভন দেখাইয়া এমনি বশ করিয়া লইয়াছে যে, সে অনায়াসে নবদ্বীপের পক্ষে সাক্ষ্য দিল। জয়শ্রী যখন বরদা-সুন্দরীকে ত্যাগ করিয়া অন্য পক্ষে যাইবার আয়োজন করিতেছে, তখন রামকানাইকে ডাক পড়িল।

অনাহারে মৃতপ্রায় শুষ্ককণ্ঠ শুষ্করসনা বৃদ্ধ কম্পিত শীর্ণ অঙ্গুলি দিয়া সাক্ষ্যমঞ্চের কাঠগড়া চাপিয়া ধরিলেন। চতুর ব্যারিষ্টার অত্যন্ত কৌশলে কথা বাহির করিয়া লইবার জন্য জেরা করিতে আরম্ভ করিলেন—বহুদূর হইতে আরম্ভ করিয়া সাবধানে অতি ধীর বক্রগতিতে প্রসঙ্গের নিকবর্ত্তী হইবার উদ্যোগ করিতে লাগিলেন।

তখন রামকানাই জজের দিকে ফিরিয়া জোড়হস্তে কহিলেন, "হুজুর, আমি বৃদ্ধ, অত্যন্ত দুর্ব্বল। অধিক কথা কহিবার সামর্থ্য নাই। আমার যা বলিবার সংক্ষেপে বলিয়া লই। আমার দাদা স্বর্গীয় গুরুচরণ চক্রবর্ত্তী মৃত্যুকালে সমস্ত বিষয় সম্পত্তি তাঁহার পত্নী শ্রীমতী বরদাসুন্দরীকে উইল করিয়া দিয়া যান। সে উইল আমি নিজহস্তে লিখিয়াছি এবং দাদা নিজহস্তে স্বাক্ষর করিয়াছেন। আমার পুত্র নবদ্বীপচন্দ্র যে উইল দাখিল করিয়াছেন তাহা মিথ্যা।" এই বলিয়া রামকানাই কাঁপিতে কাঁপিতে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন।

চতুর ব্যারিষ্টার সকৌতুকে পার্শ্ববর্ত্তী অ্যাটর্ণিকে বলিলেন, "বাই জোভ্! লোকটাকে কেমন ঠেসে ধরেছিলুম?"

মামাতো ভাই ছুটিয়া গিয়া দিদিকে বলিল—"বুড়ো সমস্ত মাটী করিয়াছিল—আমার সাক্ষ্যে মকদ্দমা রক্ষা পায়।"

দিদি বলিলেন, "বটে, বটে ? লোক কে চিন্‌তে পারে ! আমি বুড়োকে ভাল বলে জানতুম !"

কারাবরুদ্ধ নবদ্বীপের বুদ্ধিমান বন্ধুরা অনেক ভাবিয়া স্থির করিল নিশ্চয়ই বৃদ্ধ ভয়ে এই কাজ করিয়া ফেলিয়াছে। সাক্ষীর বাক্‌সের মধ্যে উঠিয়া বুড়া বুদ্ধি ঠিক রাখিতে পারে নাই। এমনতর আস্ত নির্ব্বোধ সমস্ত সহর খুঁজিলে মিলে না।

কাবুলিওয়ালা।

আমার পাঁচ বছর বয়সের ছোট মেয়ে মিনি এক দণ্ড কথা না কহিয়া থাকিতে পারে না। পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করিয়া ভাষা শিক্ষা করিতে সে কেবল একটি বৎসর কাল ব্যয় করিয়াছিল, তাহার পর হইতে যতক্ষণ সে জাগিয়া থাকে এক মুহূর্ত্ত মৌনভাবে নষ্ট করে না। তাহার মা অনেক সময় ধমক দিয়া তাহার মুখ বন্ধ করিয়া দেয়, কিন্তু আমি তাহা পারি না। মিনি চুপ করিয়া থাকিলে এমনি অস্বাভাবিক দেখিতে হয় যে সে আমার বেশিক্ষণ সহ্য হয় না। এই জন্য আমার সঙ্গে তাহার কথোপকথনটা কিছু উৎসাহের সহিত চলে।

সকাল বেলায় আমার নভেলের সপ্তদশ পরিচ্ছেদে হাত দিয়াছি এমন সময় মিনি আসিয়াই আরম্ভ করিয়া দিল, "বাবা, রামদয়াল দরোয়ান কাককে কৌয়া বল্‌ছিল, সে কিছু জানে না। না ?"

আমি, পৃথিবীতে ভাষার বিভিন্নতা সম্বন্ধে তাহাকে জ্ঞানদান করিতে প্রবৃত্ত হইবার পূর্ব্বেই সে দ্বিতীয় প্রসঙ্গে উপনীত হইল। "দেখ বাবা, ভোলা বল্‌ছিল আকাশে হাতি শুঁড় দিয়ে জল ফেলে তাই বৃষ্টি হয়। মাগো, ভোলা এত মিছিমিছি বক্‌তে পারে ? কেবলি বকে, দিনরাত বকে !"

সে পরক্ষণেই আমার লিখিবার টেবিলের পার্শ্বে আমার পায়ের কাছে বসিয়া নিজের দুই হাঁটু এবং হাত লইয়া অতি দ্রুত উচ্চারণে আগ্‌ডুম্ বাগ্‌ডুম্ খেলিতে আরম্ভ করিয়া দিল।

আমার ঘর পথের ধারে। হঠাৎ মিনি আগ্‌ডুম বাগ্‌ডুম খেলা রাখিয়া জানালার ধারে ছুটিয়া গেল এবং চীৎকার করিয়া ডাকিতে লাগিল, "কাবুলিওয়ালা, ও কাবুলিওয়ালা !"

ময়লা ঢিলা কাপড় পরা, পাগড়ি মাথায়, ঝুলি ঘাড়ে, হাতে গোটা দুইচার আঙুরের বাক্স, এক লম্বা কাবুলিওয়ালা মৃদুমন্দ গমনে পথ দিয়া যাইতেছিল, তাহাকে দেখিয়া আমার কন্যারত্নের কিরূপ ভাবোদয় হইল বলা শক্ত, তাহাকে ঊর্দ্ধস্বরে ডাকাডাকি আরম্ভ করিয়া দিল। আমি ভাবিলাম, এখনি ঝুলি ঘাড়ে একটা আপদ আসিয়া উপস্থিত হইবে, আমার সপ্তদশ পরিচ্ছেদ আর শেষ হইবে না।

কিন্তু মিনির চীৎকারে যেমনি কাবুলিওয়ালা হাসিয়া মুখ ফিরাইল এবং আমাদের বাড়ির দিকে আসিতে লাগিল, অমনি সে ঊর্দ্ধশ্বাসে অন্তঃপুরে দৌড় দিল, তাহার আর চিহ্ন দেখিতে পাওয়া গেল না। তাহার মনের মধ্যে একটা অন্ধ বিশ্বাসের মত ছিল যে, ঐ ঝুলিটার ভিতরে সন্ধান করিলে তাহার মত দুটো চারটে জীবিত মানবসন্তান পাওয়া যাইতে পারে।

এদিকে কাবুলিওয়ালা আসিয়া সহাস্যে আমাকে সেলাম করিয়া দাঁড়াইল—আমি ভাবিলাম, যদিচ প্রতাপ সিংহ এবং কাঞ্চনমালার অবস্থা অত্যন্ত সঙ্কটাপন্ন, তথাপি লোকটাকে ঘরে ডাকিয়া আনিয়া তাহার কাছ হইতে কিছু না কেনাটা ভাল হয় না।

কিছু কেনা গেল। তাহার পর পাঁচটা কথা আসিয়া পড়িল। আবদর রহমান, রুষ, ইংরাজ প্রভৃতিকে লইয়া সীমান্তরক্ষানীতি সম্বন্ধে গল্প চলিতে লাগিল।

অবশেষে উঠিয়া যাইবার সময় সে জিজ্ঞাসা করিল, "বাবু, তোমার লড়্‌কী কোথা গেল?"

আমি মিনির অমূলক ভয় ভাঙাইয়া দিবার অভিপ্রায়ে তাহাকে অন্তঃপুর হইতে ডাকাইয়া আনিলাম—সে আমার গা ঘেঁসিয়া কাবুলীর মুখ এবং ঝুলির দিকে সন্দিগ্ধনেত্রক্ষেপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। কাবুলি ঝুলির মধ্য হইতে কিস্‌মিস্‌ খোবানি বাহির করিয়া তাহাকে দিতে গেল, সে কিছুতেই লইল না, দ্বিগুণ সন্দেহের সহিত আমার হাঁটুর কাছে সংলগ্ন হইয়া রহিল। প্রথম পরিচয়টা এমনি ভাবে গেল।

কিছুদিন পরে একদিন সকাল বেলায় আবশ্যকবশত বাড়ি হইতে বাহির হইবার সময় দেখি, আমার দুহিতাটি দ্বারের সমীপস্থ বেঞ্চির উপর বসিয়া অনর্গল কথা কহিয়া যাইতেছে, কাবুলিওয়ালা তাহার পদতলে বসিয়া সহাস্যমুখে শুনিতেছে এবং মধ্যে মধ্যে প্রসঙ্গক্রমে নিজের মতামতও দো-আঁস্‌লা বাঙ্গলায় ব্যক্ত করিতেছে। মিনির পঞ্চমবর্ষীয় জীবনের অভিজ্ঞতায় বাবা ছাড়া এমন ধৈর্য্যবান্‌ শ্রোতা সে কখনো পায় নাই। আবার দেখি, তাহার ক্ষুদ্র আঁচল বাদাম কিস্‌মিসে পরিপূর্ণ। আমি কাবুলিওয়ালাকে কহিলাম, "উহাকে এ সব কেন দিয়াছ? অমন আর দিওনা।" বলিয়া পকেট হইতে একটা আধুলি লইয়া তাহাকে দিলাম। সে অসঙ্কোচে আধুলি গ্রহণ করিয়া ঝুলিতে পুরিল।

বাড়িতে ফিরিয়া আসিয়া দেখি, সেই আধুলিটি লইয়া ষোল আনা গোলযোগ বাধিয়া গেছে।

মিনির মা একটা শ্বেত চক্‌চকে গোলাকার পদার্থ লইয়া

ভর্ৎসনার স্বরে মিনিকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন, "তুই এ আধুলি কোথায় পেলি ?"

মিনি বলিতেছে, "কাবুলিওয়ালা দিয়েচে।"

তাহার মা বলিতেছেন, "কাবুলিওয়ালার কাছ হইতে আধুলি তুই কেন নিতে গেলি !"

মিনি ক্রন্দনের উপক্রম করিয়া কহিল, "আমি চাইনি, সে আপনি দিল !"

আমি আসিয়া মিনিকে তাহার আসন্ন বিপদ হইতে উদ্ধার করিয়া বাহিরে লইয়া গেলাম।

সংবাদ পাইলাম, কাবুলিওয়ালার সহিত মিনির এই যে দ্বিতীয় সাক্ষাৎ, তাহা নহে, ইতিমধ্যে সে প্রায় প্রত্যহ আসিয়া পেস্তা বাদাম ঘুস দিয়া মিনির ক্ষুদ্র হৃদয়টুকু অনেকটা অধিকার করিয়া লইয়াছে।

দেখিলাম, এই দুটি বন্ধুর মধ্যে গুটিকতক বাঁধা কথা এবং ঠাট্টা প্রচলিত আছে—যথা, রহমৎকে দেখিবামাত্র আমার কন্যা হাসিতে হাসিতে জিজ্ঞাসা করিত, "কাবুলিওয়ালা, ও কাবুলিওয়ালা, তোমার ও ঝুলির ভিতরে কি ?"

রহমৎ একটা অনাবশ্যক চন্দ্রবিন্দু যোগ করিয়া হাসিতে হাসিতে উত্তর করিত, "হাঁতি।"

অর্থাৎ তাহার ঝুলির ভিতরে যে একটা হস্তী আছে এইটেই তাহার পরিহাসের সূক্ষ্ম মর্ম্ম।—খুব যে বেশি সূক্ষ্ম তাহা বলা যায় না, তথাপি এই পরিহাসে উভয়েই বেশ একটু কৌতুক অনুভব করিত—এবং শরৎকালের প্রভাতে একটি বয়স্ক এবং একটি অপ্রাপ্তবয়স্ক শিশুর সরল হাস্য দেখিয়া আমারও বেশ লাগিত।

উহাদের মধ্যে আরো একটা কথা প্রচলিত ছিল। রহমৎ মিনিকে বলিত, "খোঁখী, তোমি সসুর-বাড়ি কখুনু যাবে না!"

বাঙালীর ঘরের মেয়ে আজন্মকাল "শ্বশুর-বাড়ি" শব্দটার সহিত পরিচিত, কিন্তু আমরা কিছু এ-কেলে ধরনের লোক হওয়াতে শিশু মেয়েকে শ্বশুর-বাড়ি সম্বন্ধে সজ্ঞান করিয়া তোলা হয় নাই। এই জন্য রহমতের অনুরোধটা সে পরিষ্কার বুঝিতে পারিত না, অথচ কথাটার একটা কোন জবাব না দিয়া চুপ করিয়া থাকা নিতান্ত তাহার স্বভাববিরুদ্ধ, সে উল্টিয়া জিজ্ঞাসা করিত, "তুমি, শ্বশুর-বাড়ি যাবে?"

রহমৎ কাল্পনিক শ্বশুরের প্রতি প্রকাণ্ড মোটা মুষ্টি আস্ফালন করিয়া বলিত, "হামি সসুরকে মারবে।"

শুনিয়া মিনি শ্বশুর নামক কোন এক অপরিচিত জীবের দুরবস্থা কল্পনা করিয়া অত্যন্ত হাসিত।

এখন শুভ্র শরৎকাল। প্রাচীনকালে এই সময়েই রাজারা দিগ্বিজয়ে বাহির হইতেন। আমি কলিকাতা ছাড়িয়া কখন কোথাও যাই নাই, কিন্তু সেই জন্যই আমার মনটা পৃথিবীময় ঘুরিয়া বেড়ায়। আমি যেন আমার ঘরের কোণে চিরপ্রবাসী, বাহিরের পৃথিবীর জন্য আমার সর্ব্বদা মন-কেমন করে। একটা বিদেশের নাম শুনিলেই অমনি আমার চিত্ত ছুটিয়া যায়, তেমন বিদেশী লোক দেখিলেই অমনি নদী পর্ব্বত অরণ্যের মধ্যে একটা কুটীরের দৃশ্য মনে উদয় হয়, এবং একটা উল্লাসপূর্ণ স্বাধীন জীবনযাত্রার কথা কল্পনায় জাগিয়া উঠে।

এদিকে আবার আমি এমনি উদ্ভিজ্জপ্রকৃতি যে আমার কোণটুকু ছাড়িয়া একবার বাহির হইতে গেলে মাথায় বজ্রাঘাত

হয়। এই জন্য সকালবেলায় আমার ছোট ঘরে টেবিলের সামনে বসিয়া এই কাবুলির সঙ্গে গল্প করিয়া আমার অনেকটা ভ্রমণের কাজ হইত। দুইধারে বন্ধুর দুর্গম দগ্ধ রক্তবর্ণ উচ্চ গিরিশ্রেণী, মধ্যে সঙ্কীর্ণ মরুপথ, বোঝাই করা উষ্ট্রের শ্রেণী চলিয়াছে; পাগ্‌ড়ি-পরা বণিক ও পথিকেরা কেহ বা উটের পরে, কেহ বা পদব্রজে, কাহারো হাতে বর্শা, কাহারো হাতে সেকেলে চকমকি-ঠোকা বন্দুক; কাবুলি মেঘমন্দ্রস্বরে ভাঙা বাংলায় স্বদেশের গল্প করিত, আর এই ছবি আমার চখের সম্মুখ দিয়া চলিয়া যাইত।

মিনির মা অত্যন্ত শঙ্কিত স্বভাবের লোক। রাস্তায় একটা শব্দ শুনিলেই তাহার মনে হয় পৃথিবীর সমস্ত মাতাল আমাদের বাড়িটাই বিশেষ লক্ষ্য করিয়া ছুটিয়া আসিতেছে। এই পৃথিবীটা যে সর্ব্বত্রই চোর ডাকাত মাতাল সাপ বাঘ ম্যালেরিয়া শুঁয়াপোকা আরসোলা এবং গোরার দ্বারা পরিপূর্ণ, এত দিন (খুব বেশি দিন নহে) পৃথিবীতে বাস করিয়াও সে বিভীষিকা তাঁহার মন হইতে দূর হইয়া যায় নাই।

রহমৎ কাবুলিওয়ালা সম্বন্ধে তিনি সম্পূর্ণ নিঃসংশয় ছিলেন না। তাহার প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখিবার জন্য তিনি আমাকে বারবার অনুরোধ করিয়াছেন। আমি তাঁহার সন্দেহ হাসিয়া উড়াইয়া দিবার চেষ্টা করিলে তিনি পর্য্যায়ক্রমে আমাকে গুটিকতক প্রশ্ন করিলেন—"কখনো কি কাহারো ছেলে চুরি যায় না? কাবুলদেশে কি দাস-ব্যবসায় প্রচলিত নাই? এক জন প্রকাণ্ড কাবুলীর পক্ষে একটি ছোট ছেলে চুরি করিয়া লইয়া যাওয়া কি একেবারেই অসম্ভব?"

আমাকে মানিতে হইল ব্যাপারটা যে অসম্ভব তাহা নহে, কিন্তু অবিশ্বাস্য। বিশ্বাস করিবার শক্তি সকলের সমান নহে, এই জন্য আমার স্ত্রীর মনে ভয় রহিয়া গেল। কিন্তু তাই বলিয়া বিনা দোষে রহমৎকে আমাদের বাড়িতে আসিতে নিষেধ করিতে পারিলাম না।

প্রতি বৎসর মাঘ মাসের মাঝামাঝি রহমৎ দেশে চলিয়া যায়। এই সময়টা সমস্ত পাওনার টাকা আদায় করিবার জন্য সে বড় ব্যস্ত থাকে। বাড়ি বাড়ি ফিরিতে হয় কিন্তু তবু একবার মিনিকে দর্শন দিয়া যায়। দেখিলে বাস্তবিক মনে হয় উভয়ের মধ্যে যেন একটা ষড়যন্ত্র চলিতেছে। সকালে যেদিন আসিতে পারে না, সেদিন দেখি সন্ধ্যার সময় আসিয়াছে; অন্ধকারে ঘরের কোণে সেই ঢিলেঢালা জামা-পায়জামা-পরা সেই ঝোলা-ঝুলিওয়ালা লম্বা লোকটাকে দেখিলে বাস্তবিক হঠাৎ মনের ভিতরে একটা আশঙ্কা উপস্থিত হয়।

কিন্তু যখন দেখি মিনি "কাবুলিওয়ালা, ও কাবুলিওয়ালা" করিয়া হাসিতে হাসিতে ছুটিয়া আসে এবং দুই অসমবয়সী বন্ধুর মধ্যে পুরাতন সরল পরিহাস চলিতে থাকে তখন সমস্ত হৃদয় প্রসন্ন হইয়া উঠে।

একদিন সকালে আমার ছোট ঘরে বসিয়া প্রুফ্‌শিট্ সংশোধন করিতেছি। বিদায় লইবার পূর্ব্বে আজ দুই তিন দিন হইতে শীতটা খুব কন্‌কনে হইয়া উঠিয়াছে, চারিদিকে একেবারে হীহীকার পড়িয়া গেছে। জানালা ভেদ করিয়া সকালের রৌদ্রটী টেবিলের নীচে আমার পায়ের উপর আসিয়া পড়িয়াছে, সেই উত্তাপটুকু বেশ মধুর বোধ হইতেছে। বেলা বোধ করি আটটা

হইবে—মাথায় গলাবন্দ জড়ানো ঊষাচরগণ প্রাতর্ভ্রমণ সমাধা করিয়া প্রায় সকলে ঘরে ফিরিয়া আসিয়াছে। এমন সময় রাস্তায় ভারি একটা গোল শুনা গেল।

চাহিয়া দেখি, আমাদের রহমৎকে দুই পাহারাওয়ালা বাঁধিয়া লইয়া আসিতেছে—তাহার পশ্চাতে কৌতূহলী ছেলের দল চলিয়াছে। রহমতের গাত্রবস্ত্রে রক্তচিহ্ন, এবং একজন পাহারাওয়ালার হাতে রক্তাক্ত ছোরা। আমি দ্বারের বাহিরে গিয়া পাহারাওয়ালাকে দাঁড় করাইলাম, জিজ্ঞাসা করিলাম, "ব্যাপারটা কি ?"

কিয়দংশ তাহার কাছে কিয়দংশ রহমতের কাছে শুনিয়া জানিলাম যে আমাদের প্রতিবেশী একজন লোক রামপুরী চাদরের জন্য রহমতের কাছে কিঞ্চিৎ ধারিত—মিথ্যাপূর্ব্বক সেই দেনা সে অস্বীকার করে, এবং তাহাই লইয়া বচসা করিতে করিতে রহমৎ তাহাকে এক ছুরি বসাইয়া দিয়াছে।

রহমৎ সেই মিথ্যাবাদীর উদ্দেশে নানা রূপ অশ্রাব্য গালি দিতেছে, এমন সময়ে "কাবুলিওয়ালা, ও কাবুলিওয়ালা" করিয়া ডাকিতে ডাকিতে মিনি ঘর হইতে বাহির হইয়া আসিল।

রহমতের মুখ মুহূর্ত্তের মধ্যে কৌতুক-হাস্যে প্রফুল্ল হইয়া উঠিল। তাহার স্কন্ধে আজ ঝুলি ছিল না সুতরাং ঝুলি সম্বন্ধে তাহাদের অভ্যস্ত আলোচনা হইতে পারিল না। মিনি একেবারেই তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি শ্বশুর-বাড়ি যাবে ?"

রহমৎ হাসিয়া কহিল, "সেখানেই যাচ্চে !"

দেখিল উত্তরটা মিনির হাস্যজনক হইল না, তখন হাত দেখাইয়া বলিল—"সসুরাকে মারিতাম কিন্তু কি করিব হাত বাঁধা !"

সাংঘাতিক আঘাত করা অপরাধে কয়েক বৎসর রহমতের কারাদণ্ড হইল।

তাহার কথা একপ্রকার ভুলিয়া গেলাম। আমরা যখন ঘরে বসিয়া চিরাভ্যস্তমত নিত্য কাজের মধ্যে দিনের পর দিন কাটাইতাম তখন একজন স্বাধীন পর্ব্বতচারী পুরুষ কারাপ্রাচীরের মধ্যে যে কেমন করিয়া বর্ষযাপন করিতেছে তাহা আমাদের মনেও উদয় হইত না।

আর, চঞ্চল-হৃদয়া মিনির আচরণ যে অত্যন্ত লজ্জাজনক তাহা তাহার বাপকেও স্বীকার করিতে হয়। সে স্বচ্ছন্দে তাহার পুরাতন বন্ধুকে বিস্মৃত হইয়া প্রথমে নবী সহিসের সহিত সখ্য স্থাপন করিল। পরে ক্রমে যত তাহার বয়স বাড়িয়া উঠিতে লাগিল, ততই সখার পরিবর্ত্তে একটি একটি করিয়া সখী জুটিতে লাগিল, এমন কি এখন তাহার বাবার লিখিবার ঘরেও তাহাকে আর দেখিতে পাওয়া যায় না। আমি ত তাহার সহিত এক প্রকার আড়ি করিয়াছি।

কত বৎসর কাটিয়া গেল। আর একটি শরৎকাল আসিয়াছে। আমার মিনির বিবাহের সম্বন্ধ স্থির হইয়াছে। পূজার ছুটীর মধ্যেই তাহার বিবাহ হইবে। কৈলাসবাসিনীর সঙ্গে সঙ্গে আমার ঘরের আনন্দময়ী পিতৃভবন অন্ধকার করিয়া পতিগৃহে যাত্রা করিবে।

প্রভাতটি অতি সুন্দর হইয়া উদয় হইয়াছে। বর্ষার পরে এই শরতের নূতনধৌত রৌদ্রে যেন সোহাগায়-গলানো নির্ম্মল সোনার মত রং ধরিয়াছে। এমন কি, কলিকাতার গলির ভিতরকার ইষ্টকজর্জ্জর অপরিচ্ছন্ন ঘেঁষাঘেঁষি বাড়িগুলার

উপরেও এই রৌদ্রের আভা একটি অপরূপ লাবণ্য বিস্তার করিয়াছে।

আমার ঘরে আজ রাত্রিশেষ হইতে না হইতে সানাই বাজিতেছে। সে বাঁশি যেন আমার বুকের পঞ্জরের হাড়ের মধ্যে হইতে কাঁদিয়া কাঁদিয়া বাজিয়া উঠিতেছে। করুণ ভৈরবী রাগিণীতে আমার আসন্ন বিচ্ছেদব্যথাকে শরতের রৌদ্রের সহিত সমস্ত বিশ্বজগৎময় ব্যাপ্ত করিয়া দিতেছে। আজ আমার মিনির বিবাহ।

সকাল হইতে ভারি গোলমাল, লোকজনের আনাগোনা। উঠানে বাঁশ বাধিয়া পাল খাটানো হইতেছে; বাড়ির ঘরে ঘরে এবং বারান্দায় ঝাড় টাঙাইবার ঠুংঠাং শব্দ উঠিতেছে, হাঁকডাকের সীমা নাই।

আমি আমার লিখিবার ঘরে বসিয়া হিসাব দেখিতেছি, এমন সময় রহমৎ আসিয়া সেলাম করিয়া দাঁড়াইল।

আমি প্রথমে তাহাকে চিনিতে পারিলাম না। তাহার সে ঝুলি নাই, তাহার সে লম্বা চুল নাই, তাহার শরীরে পূর্ব্বের মত সে তেজ নাই। অবশেষে তাহার হাসি দেখিয়া তাহাকে চিনিলাম।

কহিলাম, "কিরে রহমৎ, কবে আসিলি?"

সে কহিল, "কাল সন্ধ্যাবেলা জেল হইতে খালাস পাইয়াছি।"

কথাটা শুনিয়া কেমন কানে খট করিয়া উঠিল। কোন খুনীকে কখন প্রত্যক্ষ দেখি নাই, ইহাকে দেখিয়া, সমস্ত অন্তঃকরণ যেন সঙ্কুচিত হইয়া গেল। আমার ইচ্ছা করিতে লাগিল, আজিকার এই শুভদিনে এ লোকটা এখান হইতে গেলেই ভাল হয়।

আমি তাহাকে কহিলাম, "আজ আমাদের বাড়িতে একটা কাজ আছে, আমি কিছু ব্যস্ত আছি তুমি আজ যাও।—"

কথাটা শুনিয়াই সে তৎক্ষণাৎ চলিয়া যাইতে উদ্যত হইল, অবশেষে দরজার কাছে গিয়া একটু ইতস্তত করিয়া কহিল, "খোঁকীকে একবার দেখিতে পাইব না?"

তাহার মনে বুঝি বিশ্বাস ছিল, মিনি সেই ভাবেই আছে। সে যেন মনে করিয়াছিল, মিনি আবার সেই পূর্ব্বের মত "কাবুলি-ওয়ালা, ও কাবুলিওয়ালা" করিয়া ছুটিয়া আসিবে, তাহাদের সেই অত্যন্ত কৌতুকাবহ পুরাতন হাস্যালাপের কোনরূপ ব্যত্যয় হইবে না। এমন কি, পূর্ব্ববন্ধুত্ব স্মরণ করিয়া সে একবাক্স আঙুর এবং কাগজের মোড়কে কিঞ্চিৎ কিসমিস্ বাদাম বোধ করি কোন স্বদেশীয় বন্ধুর নিকট হইতে চাহিয়া চিন্তিয়া সংগ্রহ করিয়া আনিয়াছিল– তাহার সে নিজের ঝুলিটি আর ছিল না।

আমি কহিলাম—"আজ বাড়িতে কাজ আছে, আজ আর কাহারো সহিত দেখা হইতে পারিবে না।"

সে যেন কিছু ক্ষুণ্ণ হইল। স্তব্ধভাবে দাঁড়াইয়া একবার স্থির দৃষ্টিতে আমার মুখের দিকে চাহিল, তারপরে—"বাবু সেলাম্" বলিয়া দ্বারের বাহির হইয়া গেল।

আমার মনে কেমন একটু ব্যথা বোধ হইল। মনে করিতেছি তাহাকে ফিরিয়া ডাকিব, এমন্ সময়ে দেখি সে আপনি ফিরিয়া আসিতেছে।

কাছে আসিয়া কহিল, "এই আঙুর এবং কিস্‌মিস্ বাদাম খোঁখীর জন্য আনিয়াছিলাম, তাহাকে দিবেন।"

আমি সেগুলি লইয়া দাম দিতে উদ্যত হইলে সে হঠাৎ আমার

হাত চাপিয়া ধরিল,—কহিল—"আপনার বহুত দয়া আমার চিরকাল স্মরণ থাকিবে—আমাকে পয়সা দিবেন না।

"বাবু, তোমার যেমন একটী লড়্‌কী আছে, তেমনি দেশে আমারও একটী লড়্‌কী আছে। আমি তাহার মুখখানি স্মরণ করিয়া তোমার খোঁখীর জন্য কিছু কিছু মেওয়া হাতে লইয়া আসি, আমি ত সওদা করিতে আসি না।—"

এই বলিয়া সে আপনার মস্ত ঢিলা জামাটার ভিতর হাত চালাইয়া দিয়া বুকের কাছে কোথা হইতে এক টুকরা ময়লা কাগজ বাহির করিল। বহু যত্নে ভাঁজ খুলিয়া দুই হস্তে আমার টেবিলের উপর মেলিয়া ধরিল।

দেখিলাম কাগজের উপর একটি ছোট হাতের ছাপ। ফোটগ্রাফ নহে, তেলের ছবি নহে, হাতে খানিকটা ভুষা মাখাইয়া কাগজের উপরে তাহারই চিহ্ন ধরিয়া লইয়াছে। কন্যার এই স্মরণ-চিহ্নটুকু বুকের কাছে লইয়া রহমৎ প্রতিবৎসর কলিকাতার রাস্তায় মেওয়া বেচিতে আসে—যেন সেই সুকোমল ক্ষুদ্র শিশুহস্ত-টুকুর স্পর্শখানি তাহার বিরাট বিরহী-বক্ষের মধ্যে সুধাসঞ্চার করিয়া রাখে।

দেখিয়া আমার চোখ ছল্‌ছল্‌ করিয়া আসিল। তখন, সে যে একজন কাবুলা মেওয়াওয়ালা, আর আমি যে একজন বাঙালী সম্ভ্রান্তবংশীয় তাহা ভুলিয়া গেলাম—তখন বুঝিতে পারিলাম সেও যে আমিও সে; সেও পিতা আমিও পিতা। তাহার পর্ব্বত-গৃহবাসিনী ক্ষুদ্র পার্ব্বতীর সেই হস্তচিহ্ন আমারই মিনিকে স্মরণ করাইয়া দিল। আমি তৎক্ষণাৎ তাহাকে অন্তঃপুর হইতে ডাকাইয়া পাঠাইলাম। অন্তঃপুরে ইহাতে অনেক আপত্তি উঠিয়াছিল।

কিন্তু আমি কিছুতেই কর্ণপাত করিলাম না। রাঙা চেলিপরা, কপালে চন্দন আঁকা বধূবেশিনী মিনি সলজ্জভাবে আমার কাছে আসিয়া দাঁড়াইল।

তাহাকে দেখিয়া কাবুলিওয়ালা প্রথম থতমত খাইয়া গেল, তাহাদের পুরাতন আলাপ জমাইতে পারিল না। অবশেষে হাসিয়া কহিল—"খোঁখী, তোমি সসুর-বারি যাবিস্?"

মিনি এখন শ্বশুর-অর্থ বোঝে, এখন আর সে পূর্ব্বের মত উত্তর দিতে পারিল না—রহমতের প্রশ্ন শুনিয়া লজ্জায় আরক্ত হইয়া মুখ ফিরাইয়া দাঁড়াইল। কাবুলিওয়ালার সহিত মিনির যেদিন প্রথম সাক্ষাৎ হইয়াছিল, আমার সেই দিনের কথা মনে পড়িল। মনটা কেমন ব্যথিত হইয়া উঠিল।

মিনি চলিয়া গেলে একটা গভীর দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া রহমৎ মাটিতে বসিয়া পড়িল। সে হঠাৎ স্পষ্ট বুঝিতে পারিল তাহার মেয়েটিও ইতিমধ্যে এইরূপ বড় হইয়াছে, তাহার সঙ্গেও আবার নূতন আলাপ করিতে হইবে—তাহাকে ঠিক পূর্ব্বের মত তেমনটি আর পাইবে না। এ আট বৎসরে তাহার কি হইয়াছে তাই বা কে জানে। সকাল বেলায় শরতের স্নিগ্ধ রৌদ্রকিরণের মধ্যে সানাই বাজিতে লাগিল, রহমৎ কলিকাতার এক গলির ভিতরে বসিয়া আফগানিস্থানের এক মরুপর্ব্বতের দৃশ্য দেখিতে লাগিল।

আমি একখানি নোট লইয়া তাহাকে দিলাম। বলিলাম, রহমৎ তুমি দেশে তোমার মেয়ের কাছে ফিরিয়া যাও: তোমাদের মিলনসুখে আমার মিনির কল্যাণ হৌক্।

এই টাকাটা দান করিয়া, হিসাব হইতে উৎসব-সমারোহের

হুটো একটা অঙ্গ ছাঁটিয়া দিতে হইল। যেমন মনে করিয়াছিলাম তেমন করিয়া ইলেক্ট্রিক আলো জ্বালাইতে পারিলাম না, গড়ের বাদ্যও বাদ পড়িল, অন্তঃপুরে মেয়েরা অত্যন্ত অসন্তোষ প্রকাশ করিতে লাগিলেন, কিন্তু মঙ্গল-আলোকে আমার শুভ উৎসব উজ্জ্বল হইয়া উঠিল।

স্বর্ণমৃগ

আদ্যনাথ এবং বৈদ্যনাথ চক্রবর্ত্তী দুই সরিক্‌। উভয়ের মধ্যে বৈদ্যনাথের অবস্থাই কিছু খারাপ। বৈদ্যনাথের বাপ মহেশচন্দ্রের বিষয়বুদ্ধি আদৌ ছিল না, তিনি দাদা শিবনাথের উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করিয়া থাকিতেন। শিবনাথ ভাইকে প্রচুর স্নেহবাক্য দিয়া তৎপরিবর্ত্তে তাঁহার বিষয়সম্পত্তি সমস্ত আত্মসাৎ করিয়া লন। কেবল খানকতক কোম্পানির কাগজ অবশিষ্ট থাকে। জীবনসমুদ্রে সেই কাগজ ক'খানি বৈদ্যনাথের একমাত্র অবলম্বন।

শিবনাথ বহু অনুসন্ধানে তাঁহার পুত্র আদ্যনাথের সহিত এক ধনীর একমাত্র কন্যার বিবাহ দিয়া বিষয়বৃদ্ধির আরএকটি সুযোগ করিয়া রাখিয়াছেন। মহেশচন্দ্র একটি সপ্তকন্যাভারগ্রস্ত দরিদ্র ব্রাহ্মণের প্রতি দয়া করিয়া এক পয়সা পণ না লইয়া তাহার জ্যেষ্ঠা কন্যাটির সহিত পুত্রের বিবাহ দেন। সাতটি কন্যাকেই যে ঘরে লন নাই তাহার কারণ, তাঁহার একটিমাত্র পুত্র এবং ব্রাহ্মণও সেরূপ অনুরোধ করে নাই। তবে, তাহাদের বিবাহের উদ্দেশে সাধ্যাতিরিক্ত অর্থসাহায্য করিয়াছিলেন।

পিতার মৃত্যুর পর বৈদ্যনাথ তাঁহার কাগজ কয়খানি লইয়া সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ত ও সন্তুষ্টচিত্তে ছিলেন। কাজকর্ম্মের কথা তাঁহার মনেও উদয় হইত না। কাজের মধ্যে তিনি গাছের ডাল কাটিয়া বসিয়া বসিয়া বহুযত্নে ছড়ি তৈরি করিতেন। রাজ্যের বালক এবং যুবকগণ তাঁহার নিকট ছড়ির জন্য উমেদার হইত, তিনি দান করিতেন। ইহা ছাড়া বদান্যতার উত্তেজনায় ছিপ, ঘুড়ি

লাঠাই নির্ম্মাণ করিতেও তাঁহার বিস্তর সময় যাইত। যাহাতে বহুযত্নে বহুকাল ধরিয়া চাঁচাছোলার আবশ্যক, অথচ সংসারের উপকারিতা দেখিলে যাহা সে পরিমাণে পরিশ্রম ও কালব্যয়ের অযোগ্য, এমন একটা হাতের কাজ পাইলে তাঁহার উৎসাহের সীমা থাকে না।

পাড়ায় যখন দলাদলি এবং চক্রান্ত লইয়া বড় বড় পবিত্র বঙ্গীয় চণ্ডীমণ্ডপ ধূমাচ্ছন্ন হইয়া উঠিতেছে তখন বৈদ্যনাথ একটি কলম-কাটা ছুরি এবং একখণ্ড গাছের ডাল লইয়া প্রাতঃকাল হইতে মধ্যাহ্ন এবং আহার ও নিদ্রার পর হইতে সায়াহ্নকাল পর্য্যন্ত নিজের দাওয়াটিতে একাকী অতিবাহিত করিতেছেন এমন প্রায় দেখা যাইত।

ষষ্ঠীর প্রসাদে শক্রর মুখে যথাক্রমে ছাই দিয়া বৈদ্যনাথের দুইটি পুত্র এবং একটি কন্যা জন্মগ্রহণ করিল।

গৃহিণী মোক্ষদাসুন্দরীর অসন্তোষ প্রতিদিন বাড়িয়া উঠিতেছে। আদ্যানাথের ঘরে যেরূপ সমারোহ বৈদ্যনাথের ঘরে কেন সেরূপ না হয়! ও বাড়ির বিন্ধ্যবাসিনীর যেমন গহনাপত্র, বেনারসী সাড়ি, কথাবার্ত্তার ভঙ্গী এবং চালচলনের গৌরব মোক্ষদার যে ঠিক তেমনটা হইয়া উঠে না, ইহা অপেক্ষা যুক্তিবিরুদ্ধ ব্যাপার আর কি হইতে পারে! অথচ একই ত পরিবার! ভাইয়ের বিষয় বঞ্চনা করিয়া লইয়াই ত উহাদের এত উন্নতি! যত শোনে ততই মোক্ষদার হৃদয়ে নিজের শ্বশুরের প্রতি এবং শ্বশুরের একমাত্র পুত্রের প্রতি অশ্রদ্ধা এবং অবজ্ঞা আর ধরে না! নিজগৃহের কিছুই তাঁহার ভাল লাগে না। সকলি অসুবিধা এবং মানহানিজনক।

বৈদ্যনাথ বুঝিতে পারিলেন ছড়ি চাঁচিয়া আর চলে না। একটা কিছু উপায় করা চাই। চাকরি করা অথবা ব্যবসা করা বৈদ্যনাথের পক্ষে দুরাশা। অতএব কুবেরের ভাণ্ডারে প্রবেশ করিবার একটা সংক্ষেপ রাস্তা আবিষ্কার করা চাই।

একদিন রাত্রে বিছানায় শুইয়া কাতরভাবে প্রার্থনা করিলেন, "হে মা জগদম্বে, স্বপ্নে যদি একটা দুঃসাধ্য রোগের পেটেণ্ট ঔষধ বলিয়া দাও, কাগজে বিজ্ঞাপন লিখিবার ভার আমি লইব।"

পরদিন প্রাতঃকৃত্য সমাপন করিয়া একাকী বসিয়া ঘুড়ির লখ্ তৈরি করিতেছেন এমন সময় এক সন্ন্যাসী জয়ধ্বনি উচ্চারণ করিয়া দ্বারে আগত হইল। সেই মুহূর্ত্তেই বিদ্যুতের মত বৈদ্যনাথ ভাবী ঐশ্বর্য্যের উজ্জ্বল মূর্ত্তি দেখিতে পাইলেন। সন্ন্যাসীকে প্রচুর পরিমাণে আদর অভ্যর্থনা ও আহার্য্য যোগাইলেন। অনেক সাধ্যসাধনার পর জানিতে পারিলেন সন্ন্যাসী সোনা তৈরি করিতে পারে এবং সে বিদ্যা তাঁহাকে দান করিতেও সে অসম্মত হইল না।

গৃহিণীও নাচিয়া উঠিলেন। যকৃতের বিকার উপস্থিত হইলে লোকে যেমন সমস্ত হলুদবর্ণ দেখে, তিনি সেইরূপ পৃথিবীময় সোনা দেখিতে লাগিলেন। কল্পনা-কারিকরের দ্বারা শয়নের খাট, গৃহসজ্জা এবং গৃহপ্রাচীর পর্য্যন্ত সোনায় মণ্ডিত করিয়া মনে মনে বিন্ধ্যবাসিনীকে নিমন্ত্রণ করিলেন।

সন্ন্যাসী প্রতিদিন দুই সের করিয়া দুগ্ধ এবং দেড় সের করিয়া মোহনভোগ খাইতে লাগিল এবং বৈদ্যনাথের কোম্পানির কাগজ দোহন করিয়া অজস্র রৌপ্যরস নিঃসৃত করিয়া লইল।

ছিপ ছড়ি লাঠাইয়ের কাঙালরা বৈদ্যনাথের রুদ্ধদ্বারে নিষ্ফল

আঘাত করিয়া চলিয়া যায়। ঘরে ছেলেগুলো যথাসময়ে খাইতে পায় না, পড়িয়া গিয়া কপাল ফুলায়, কাঁদিয়া আকাশ ফাটাইয়া দেয়, কর্ত্তা গৃহিণী কাহারো ভ্রূক্ষেপ নাই। নিস্তব্ধভাবে অগ্নিকুণ্ডের সম্মুখে বসিয়া কটাহের দিকে চাহিয়া উভয়ের চোখে পল্লব নাই, মুখে কথা নাই। তৃষিত একাগ্রনেত্রে অবিশ্রান্ত অগ্নিশিখার প্রতিবিম্ব পড়িয়া চোখের মণি যেন স্পর্শমণির গুণ প্রাপ্ত হইল। দৃষ্টিপথ সায়াহ্নের সূর্য্যাস্তপথের মত জলন্ত সুবর্ণ প্রলেপে রাঙা হইয়া উঠিল।

দুখানা কোম্পানির কাগজ এই স্বর্ণ-অগ্নিতে আহুতি দেওয়ার পর একদিন সন্ন্যাসী আশ্বাস দিল, "কাল সোনার রং ধরিবে।"

সেদিন রাত্রে কাহারো ঘুম হইল না; স্ত্রীপুরুষে মিলিয়া সুবর্ণ-পুরী নির্ম্মাণ করিতে লাগিলেন। তৎসম্বন্ধে মাঝে মাঝে উভয়ের মধ্যে মতভেদ এবং তর্কও উপস্থিত হইয়াছিল কিন্তু আনন্দ-আবেগে তাহার মীমাংসা হইতে বিলম্ব হয় নাই।

পরদিন আর সন্ন্যাসীর দেখা নাই। চারিদিক হইতে সোনার রং ঘুচিয়া গিয়া সূর্য্যকিরণ পর্য্যন্ত অন্ধকার হইয়া দেখা দিল। ইহার পর হইতে শয়নের খাট গৃহসজ্জা এবং গৃহপ্রাচীর চতুর্গুণ দারিদ্র্য এবং জীর্ণতা প্রকাশ করিতে লাগিল।

এখন হইতে গৃহকার্য্যে বৈদ্যনাথ কোন একটা সামান্য মত প্রকাশ করিতে গেলে গৃহিণী তীব্রমধুর স্বরে বলেন, "বুদ্ধির পরিচয় অনেক দিয়াছ এখন কিছুদিন ক্ষান্ত থাক!" বৈদ্যনাথ একেবারে নিবিয়া যায়।

মোক্ষদা এমনি একটা শ্রেষ্ঠতার ভাব ধারণ করিয়াছে যেন এই স্বর্ণমরীচিকায় সে নিজে ঐক মুহূর্ত্তের জন্যও আশ্বস্ত হয় নাই।

অপরাধী বৈদ্যনাথ স্ত্রীকে কিঞ্চিৎ সন্তুষ্ট করিবার জন্য বিবিধ উপায় চিন্তা করিতে লাগিলেন। একদিন একটি চতুষ্কোণ মোড়কে গোপন উপহার লইয়া স্ত্রীর নিকট গিয়া প্রচুর হাস্যবিকাশ পূর্ব্বক সাতিশয় চতুরভাব সহিত ঘাড় নাড়িয়া কহিলেন, "কি আনিয়াছি বল দেখি!"

স্ত্রী কৌতূহল গোপন করিয়া উদাসীনভাবে কহিলেন, "কেমন করিয়া বলিব! আমি ত আর 'জান' নহি!"

বৈদ্যনাথ অনাবশ্যক কালব্যয় করিয়া প্রথমে দড়ির গাঁঠ অতি ধীরে ধীরে খুলিলেন তার পর ফুঁ দিয়া কাগজের ধুলা ঝাড়িলেন, তাহার পর অতি সাবধানে এক এক ভাঁজ করিয়া কাগজের মোড়ক খুলিয়া আর্টষ্টুডিয়োর রংকরা দশমহাবিদ্যার ছবি বাহির করিয়া আলোর দিকে ফিরাইয়া গৃহিণীর সম্মুখে ধরিলেন।

গৃহিণীর তৎক্ষণাৎ বিন্ধ্যবাসিনীর শয়নকক্ষের বিলাতী তেলের ছবি মনে পড়িল—অপর্য্যাপ্ত অবজ্ঞার স্বরে কহিলেন, "আ মরে যাই! এ তোমার বৈঠকখানায় রাখিয়া বসিয়া বসিয়া নিরীক্ষণ কর গে। এ আমার কাজ নাই।" বিমর্ষ বৈদ্যনাথ বুঝিলেন অন্যান্য অনেক ক্ষমতার সহিত স্ত্রীলোকের মন যোগাইবার দুরূহ ক্ষমতা হইতেও বিধাতা তাঁহাকে বঞ্চিত করিয়াছেন।

এদিকে দেশে যত দৈবজ্ঞ আছে মোক্ষদা সকলকে হাত দেখাইলেন, কোষ্ঠী দেখাইলেন। সকলেই বলিল, তিনি সধবাবস্থায় মরিবেন। কিন্তু সেই পরমানন্দময় পরিণামের জন্য তিনি একান্ত ব্যগ্র ছিলেন না, অতএব ইহাতেও তাঁহার কৌতূহল নিবৃত্তি হইল না।

শুনিলেন তাঁহার সন্তানভাগ্য ভাল, পুত্রকন্যায় তাঁহার গৃহ

অবিলম্বে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিবার সম্ভাবনা আছে; শুনিয়া তিনি বিশেষ প্রফুল্লতা প্রকাশ করিলেন না।

অবশেষে একজন গণিয়া বলিল বৎসরখানেকের মধ্যে যদি বৈদ্যনাথ দৈবধন প্রাপ্ত না হন, তাহা হইলে গণক তাহার পাঁজি-পুঁথি সমস্তই পুড়াইয়া ফেলিবে। গণকের এইরূপ নিদারুণ পণ শুনিয়া মোক্ষদার মনে আর তিলমাত্র অবিশ্বাসের কারণ রহিল না।

গণৎকাব ত প্রচুব পারিতোবিক লইয়া বিদায় হইয়াছেন, কিন্তু বৈদ্যনাথের জীবন দুর্ব্বহ হইয়া উঠিল। ধন উপার্জ্জনের কতকগুলি সাধারণ প্রচলিত পথ আছে, যেমন চাষ, চাকরি, বাবসা, চুরি এবং প্রতারণা। কিন্তু দৈবধন উপার্জ্জনেব সেরূপ নির্দ্দিষ্ট কোন উপায় নাই। এইজন্য মোক্ষদা বৈদ্যনাথকে যতই উৎসাহ দেন এবং ভর্ৎসনা করেন বৈদ্যনাথ ততই কোন দিকে রাস্তা দেখিতে পান না। কোন্ খানে খুঁড়িতে আরম্ভ করিবেন, কোন্ পুকুরে ডুবারি নামাইবেন, বাড়ির কোন প্রাচীরটা ভাঙিতে হইবে, কিছুই ভাবিয়া স্থির করিতে পারেন না।

মোক্ষদা নিতান্ত বিরক্ত হইয়া স্বামীকে জানাইলেন যে, পুরুষমানুষের মাথায় যে মস্তিষ্কের পরিবর্ত্তে এতটা গোময় থাকিতে পারে তাহা তাঁহার পূর্ব্বে ধারণা ছিল না।

বলিলেন, "একটু নড়িয়া চড়িয়া দেখ। হাঁ করিয়া বসিয়া থাকিলে কি আকাশ হইতে টাকা বৃষ্টি হইবে?"

কথাটা সঙ্গত বটে, এবং বৈদ্যনাথের একান্ত ইচ্ছাও তাই, কিন্তু কোন্ দিকে নড়িবেন কিসের উপর চড়িবেন তাহা যে কেহ বলিয়া দেয় না! অতএব দাওয়ায় বসিয়া বৈদ্যনাথ আবার [illegible]গিলেন।

এদিকে আশ্বিন মাসে দুর্গোৎসব নিকটবর্ত্তী হইল। চতুর্থীর দিন হইতে ঘাটে নৌকা আসিয়া লাগিতে লাগিল। প্রবাসীরা দেশে ফিরিয়া আসিতেছে। ঝুড়িতে মানকচু কুমড়া শুষ্ক নারিকেল টিনের বাক্সের মধ্যে ছেলেদের জন্য জুতা ছাতা কাপড় এবং প্রেয়সীর জন্য এসেন্স সাবান নূতন গল্পের বহি এবং সুবাসিত নারিকেল তৈল।

মেঘমুক্ত আকাশে শরতের সূর্য্যকিরণ উৎসবের হাস্যের মত ব্যাপ্ত হইয়া পড়িয়াছে, পক্কপ্রায় ধান্যক্ষেত্র থর্ থর্ করিয়া কাঁপিতেছে, বর্ষাধৌত সতেজ তরুপল্লব নব শীতবায়ুতে সির্ সির্ করিয়া উঠিতেছে—এবং তসরের চায়নাকোট পরিয়া কাঁধে একটা পাকান চাদর ঝুলাইয়া ছাতি মাথায় প্রত্যাগত পথিকেরা মাঠের পথ দিয়া ঘরের মুখে চলিয়াছে।

বৈদ্যনাথ বসিয়া বসিয়া তাই দেখে এবং তাহার হৃদয় হইতে দীর্ঘনিশ্বাস উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠে। নিজের নিরানন্দ গৃহের সহিত বাঙলা দেশের সহস্র গৃহের মিলনোৎসবের তুলনা করে, এবং মনে মনে বলে, "বিধাতা কেন আমাকে এমন অকর্ম্মণ্য করিয়া সৃজন করিয়াছে!"—

ছেলেরা ভোরে উঠিয়াই প্রতিমা নির্ম্মাণ দেখিবার জন্য আদ্যানাথের বাড়ির প্রাঙ্গণে গিয়া হাজির ছিল। খাবার বেলা হইলে দাসী তাহাদিগকে বলপূর্ব্বক গ্রেফ্‌তার করিয়া লইয়া আসিল। তখন বৈদ্যনাথ বসিয়া বসিয়া এই বিশ্বব্যাপী উৎসবের মধ্যে নিজের জীবনের নিষ্ফলতা স্মরণ করিতেছিলেন। দাসীর হাত হইতে ছেলে দুটিকে উদ্ধার করিয়া কোলের কাছে ঘনিষ্ঠ-ভাবে টানিয়া বড়টিকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"হাঁরে অবু, এবার পূজোর সময় কি চাস্ বল দেখি।"

অবিনাশ তৎক্ষণাৎ উত্তর করিল, "একটা নৌকো দিয়ো বাবা।"

ছোটটিও মনে করিল, বড় ভাইয়ের চেয়ে কোন বিষয়ে ন্যূন হওয়া কিছু নয়, কহিল, "আমাকেও একটা নৌকো দিয়ো বাবা।"

বাপের উপযুক্ত ছেলে! একটা অকর্ম্মণ্য কারুকার্য্য পাইলে আর কিছু চাহে না। বাপ বলিলেন, "আচ্ছা।"

এদিকে যথাকালে পূজার ছুটিতে কাশী হইতে মোক্ষদার এক খুড়া বাড়ি ফিরিয়া আসিলেন। তিনি ব্যবসায়ে উকিল। মোক্ষদা কিছুদিন ঘন ঘন তাঁহার বাড়ী যাতায়াত করিলেন।

অবশেষে একদিন স্বামীকে আসিয়া বলিলেন, "ওগো, তোমাকে কাশী যাইতে হইতেছে!"

বৈদ্যনাথ সহসা মনে করিলেন, বুঝি তাঁহার মৃত্যুকাল উপস্থিত, গণক কোষ্ঠী হইতে আবিষ্কার করিয়াছে; সহধর্ম্মিণী সেই সন্ধান পাইয়া তাঁহার সদ্গতি করিবার যুক্তি করিতেছেন।

পরে শুনিলেন, এইরূপ জনশ্রুতি যে, কাশীতে একটি বাড়ি আছে সেখানে গুপ্তধন মিলিবার কথা, সেই বাড়ি কিনিয়া তাহার ধন উদ্ধার করিয়া আনিতে হইবে।

বৈদ্যনাথ বলিলেন—"কি সর্ব্বনাশ। আমি কাশী যাইতে পারিব না!"

বৈদ্যনাথ কখনও ঘর ছাড়িয়া কোথাও যান নাই। গৃহস্থকে কি করিয়া ঘরছাড়া করিতে হয় প্রাচীন শাস্ত্রকারগণ লিখিতেছেন, স্ত্রীলোকের সে সম্বন্ধে "অশিক্ষিতপটুত্ব" আছে। মোক্ষদা মুখের কথায় ঘরের মধ্যে যেন লঙ্কার [illegible]

পারিতেন, কিন্তু তাহাতে, হতভাগ্য বৈদ্যনাথ কেবল চোখের জলে ভাসিয়া যাইত, কাশী যাইবার নাম করিত না।

দিন দুই তিন গেল। বৈদ্যনাথ বসিয়া বসিয়া কতকগুলা কাষ্ঠখণ্ড কাটিয়া কুঁদিয়া জোড়া দিয়া দুইখানি খেলার নৌকা তৈরি করিলেন। তাহাতে মাস্তল বসাইলেন, কাপড় কাটিয়া পাল আঁটিয়া দিলেন; লাল শালুর নিশান উড়াইলেন, হাল ও দাঁড় বসাইয়া দিলেন। একটি পুতুল কর্ণধার এবং আরোহীও ছাড়িলেন না। তাহাতে বহু যত্ন এবং আশ্চর্য্য নিপুণতা প্রকাশ করিলেন। সে নৌকা দেখিয়া অসহ্য চিত্তচাঞ্চল্য না জন্মে এমন সংযতচিত্ত বালক সম্প্রতি পাওয়া দুর্ল্ভ। অতএব বৈদ্যনাথ সপ্তমীর পূর্ব্বরাত্রে যখন নৌকা দুটি লইয়া ছেলেদের হাতে দিলেন তাহারা আনন্দে নাচিয়া উঠিল। একে ত নৌকার খোলটাই যথেষ্ট, তাহাতে আবার হাল আছে, দাঁড় আছে, মাস্তুল আছে, পাল আছে, আবার যথাস্থানে মাঝি বসিয়া, ইহাই তাহাদের সমধিক বিস্ময়ের কারণ হইল।

ছেলেদের আনন্দকলরবে আকৃষ্ট হইয়া মোক্ষদা আসিয়া দরিদ্র পিতার পূজার উপহার দেখিলেন।

দেখিয়া, রাগিয়া কাঁদিয়া কপালে করাঘাত করিয়া খেলেনা দুটো কাড়িয়া জান্‌লার বাহিরে ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিলেন। সোনার হার গেল, সাটিনের জামা গেল, জরির টুপি গেল, শেষে কিনা হতভাগ্য মনুষ্য দুইখানা খেলানা দিয়া নিজের ছেলেকে প্রতারণা করিতে আসিয়াছে! তাও আবার দুই পয়সা ব্যয় নাই, নিজের হাতে নির্ম্মাণ!

ছোট ছেলে ত ঊর্দ্ধশ্বাসে কাঁদিতে লাগিল। "বোকা

ছেলে” বলিয়া তাহাকে মোক্ষদা ঠাস্ করিয়া চড়াইয়া দিলেন।

বড় ছেলেটি বাপের মুখের দিকে চাহিয়া নিজের দুঃখ ভুলিয়া গেল। উল্লাসের ভাণমাত্র করিয়া কহিল, “বাবা, আমি কাল ভোরে গিয়ে কুড়িয়ে নিয়ে আস্‌ব।”

বৈদ্যনাথ তাহার পর দিন কাশী যাইতে সম্মত হইলেন। কিন্তু টাকা কোথায়! তাঁহার স্ত্রী গহনা বিক্রয় করিয়া টাকা সংগ্রহ করিলেন। বৈদ্যনাথের পিতামহীর আমলের গহনা, এমন খাঁটি সোনা এবং ভারী গহনা আজকালকার দিনে পাওয়াই যায় না।

বৈদ্যনাথের মনে হইল তিনি মরিতে যাইতেছেন। ছেলেদের কোলে করিয়া চুম্বন করিয়া সাশ্রুনেত্রে বাড়ি হইতে বাহির হইলেন। তখন মোক্ষদাও কাঁদিতে লাগিলেন।

কাশীর বাড়িওয়ালা বৈদ্যনাথের খুড়শ্বশুরের মক্কেল। বোধ করি সেই কারণে বাড়ি খুব চড়া দামেই বিক্রয় হইল। বৈদ্যনাথ একাকী বাড়ি দখল করিয়া বসিলেন। একেবারে নদীর উপরেই বাড়ি। ভিত্তি ধৌত করিয়া নদীস্রোত প্রবাহিত হইতেছে।

রাত্রে বৈদ্যনাথের গা ছম্ ছম্ করিতে লাগিল। শূন্য গৃহে শিয়রের কাছে প্রদীপ জ্বালাইয়া চাদর মুড়ি দিয়া শয়ন করিলেন। কিন্তু কিছুতেই নিদ্রা হয় না। গভীর রাত্রে যখন সমস্ত কোলাহল থামিয়া গেল তখন কোথা হইতে একটা ঝন্‌ঝন্ শব্দ শুনিয়া বৈদ্যনাথ চমকিয়া উঠিলেন। শব্দ মৃদু কিন্তু পরিষ্কার। যেন পাতালে বলিরাজের ভাণ্ডারে কোষাধ্যক্ষ বসিয়া বসিয়া টাকা গণনা করিতেছে।

বৈদ্যনাথের মনে ভয় হইল, কৌতূহল হইল এবং সেই সঙ্গে দুর্জ্জয় আশার সঞ্চার হইল। কম্পিত হস্তে প্রদীপ লইয়া ঘরে ঘরে ফিরিলেন। এঘরে গেলে মনে হয় শব্দ ওঘর হইতে আসিতেছে—ওঘরে গেলে মনে হয়, এঘর হইতে আসিতেছে। বৈদ্যনাথ সমস্ত রাত্রি কেবলই এঘর ওঘর করিলেন। দিনের বেলা সেই পাতালভেদী শব্দ অন্যান্য শব্দের সহিত মিশিয়া গেল, আর তাহাকে চিনা গেল না।

রাত্রি দুই তিন প্রহরের সময় যখন জগৎ নিদ্রিত হইল, তখন আবার সেই শব্দ জাগিয়া উঠিল। বৈদ্যনাথের চিত্ত নিতান্ত অস্থির হইল। শব্দ লক্ষ্য করিয়া কোন্ দিকে যাইবেন ভাবিয়া পাইলেন না। মরুভূমির মধ্যে জলের কল্লোল শোনা যাইতেছে অথচ কোন্ দিক্ হইতে আসিতেছে নির্ণয় হইতেছে না; ভয় হইতেছে পাছে একবার ভুল পথ অবলম্বন করিলে গুপ্ত নির্ঝরিণী একেবারে আয়ত্তের অতীত হইয়া যায়। তৃষিত পথিক স্তব্ধভাবে দাঁড়াইয়া প্রাণপণে কান খাড়া করিয়া থাকে, এদিকে তৃষ্ণা উত্তরোত্তর প্রবল হইয়া উঠে—বৈদ্যনাথের সেই অবস্থা হইল।

বহুদিন অনিশ্চিত অবস্থাতেই কাটিয়া গেল। কেবল অনিদ্রা এবং বৃথা আশ্বাসে তাঁহার সন্তোষস্নিগ্ধ মুখে ব্যগ্রতার তীব্রভাব রেখাঙ্কিত হইয়া উঠিল। কোটরনিবিষ্ট চকিতনেত্রে মধ্যাহ্নের মরুবালুকার মত একটা জ্বালা প্রকাশ পাইল।

অবশেষে একদিন দ্বিপ্রহরে সমস্ত দ্বার রুদ্ধ করিয়া ঘরের মেঝেময় শাবল ঠুকিয়া শব্দ করিতে লাগিলেন। একটি পার্শ্ববর্ত্তী ছোট কুঠরির মেঝের মধ্য হইতে ফাঁপা আওয়াজ দিল।

রাত্রি নিষুপ্ত হইলে পর বৈদ্যনাথ একাকী বসিয়া সেই মেঝে খনন করিতে লাগিলেন। যখন রাত্রি প্রভাতপ্রায়, তখন ছিদ্র-খনন সম্পূর্ণ হইল।

বৈদ্যনাথ দেখিলেন নীচে একটা ঘরের মত আছে—কিন্তু সেই রাত্রের অন্ধকারে তাহার মধ্যে নির্ব্বিচারে পা নামাইয়া দিতে সাহস করিলেন না। গর্ত্তের উপর বিছানা চাপা দিয়া শয়ন করিলেন। কিন্তু শব্দ এমনি পরিস্ফুট হইয়া উঠিল যে ভয়ে সেখান হইতে উঠিয়া আসিলেন—অথচ গৃহ অরক্ষিত রাখিয়া দ্বার ছাড়িয়া দূরে যাইতে প্রবৃত্তি হইল না। লোভ এবং ভয় দুই দিক হইতে দুই হাত ধরিয়া টানিতে লাগিল। রাত কাটিয়া গেল।

আজ দিনের বেলাও শব্দ শুনা যায়। ভৃত্যকে ঘরের মধ্যে ঢুকিতে না দিয়া বাহিরে আহারাদি করিলেন। আহারান্তে ঘরে ঢুকিয়া দ্বারে চাবি লাগাইয়া দিলেন।

দুর্গানাম উচ্চারণ করিয়া গহ্বরমুখ হইতে বিছানা সরাইয়া ফেলিলেন। জলের ছল্‌ছল্‌ এবং ধাতুদ্রব্যের ঠংঠং খুব পরিষ্কার শুনা গেল।

ভয়ে ভয়ে গর্ত্তের কাছে আস্তে আস্তে মুখ লইয়া গিয়া দেখিলেন অনতিউচ্চ কক্ষের মধ্যে জলের স্রোত প্রবাহিত হইতেছে—অন্ধকারে আর বিশেষ কিছু দেখিতে পাইলেন না।

একটা বড় লাঠি নামাইয়া দেখিলেন জল এক হাঁটুর অধিক নহে। একটি দেশালাই ও বাতি লইয়া সেই অগভীর গৃহের মধ্যে অনায়াসে লাফাইয়া পড়িলেন। পাছে এক মুহূর্ত্তে সমস্ত আশা নিবিয়া যায় এইজন্য বাতি জ্বালাইতে হাত কাঁপিতে

লাগিল। অনেকগুলি দেশালাই নষ্ট করিয়া অবশেষে বাতি জ্বলিল।

দেখিলেন, একটি মোটা লোহার শিকলিতে একটি বৃহৎ তামার কলসী বাঁধা রহিয়াছে, এক একবার জলের স্রোত প্রবল হয় এবং শিকলি কলসীর উপর পড়িয়া শব্দ করিতে থাকে।

বৈদ্যনাথ জলের উপর ছল্‌ছল্‌ শব্দ করিতে করিতে তাড়াতাড়ি সেই কলসীর কাছে উপস্থিত হইলেন। গিয়া দেখিলেন কলসী শূন্য।

তথাপি নিজের চক্ষুকে বিশ্বাস করিতে পারিলেন না—দুই হস্তে কলসী তুলিয়া খুব করিয়া ঝাঁকানি দিলেন। ভিতরে কিছুই নাই। উপুড় করিয়া ধরিলেন। কিছুই পড়িল না। দেখিলেন কলসীর গলা ভাঙা। যেন এককালে এই কলসীর মুখ সম্পূর্ণ বন্ধ ছিল, কে ভাঙিয়া ফেলিয়াছে।

তখন বৈদ্যনাথ জলের মধ্যে দুই হস্ত দিয়া পাগলের মত হাতড়াইতে লাগিলেন। কর্দ্দমস্তরের মধ্যে হাতে কি একটা ঠেকিল, তুলিয়া দেখিলেন মড়ার মাথা—সেটাও একবার কানের কাছে লইয়া ঝাঁকাইলেন—ভিতরে কিছুই নাই। ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিলেন। অনেক খুঁজিয়া নরকঙ্কালের অস্থি ছাড়া আর কিছুই পাইলেন না।

দেখিলেন নদীর দিকে দেয়ালের এক জায়গা ভাঙা; সেইখান দিয়া জল প্রবেশ করিতেছে, এবং তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী যে ব্যক্তির কোষ্ঠীতে দৈবধনলাভ লেখা ছিল, সেও সম্ভবত এই ছিদ্র দিয়া প্রবেশ করিয়াছিল।

অবশেষে সম্পূর্ণ হতাশ হইয়া "মা" বলিয়া মস্ত একটা মর্ম্মভেদী

দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিলেন—প্রতিধ্বনি যেন অতীত কালের আরো অনেক হতাশ্বাস ব্যক্তির নিশ্বাস একত্রিত করিয়া ভীষণ গাম্ভীর্য্যের সহিত পাতাল হইতে ধ্বনিত হইয়া উঠিল।

সর্ব্বাঙ্গে জলকাদা মাখিয়া বৈদ্যনাথ উপরে উঠিলেন।

জনপূর্ণ কোলাহলময় পৃথিবী তাঁহার নিকটে আদ্যোপান্ত [illegible] এবং সেই শৃঙ্খলবদ্ধ ভগ্নঘটের মত শূন্য বোধ হইল।

আ[illegible]র সে[illegible]জিনিষপত্র বাঁধিতে হইবে, টিকিট কিনিতে হইবে, গাড়ী চড়িতে [illegible] বাড়ি ফিরিতে হইবে, স্ত্রীর সহিত বাক্‌বিতণ্ডা করিতে হইবে, [illegible] প্রতিদিন বহন করিতে হইবে; সে তাহার অসহ্য বলিয়া বোধ হইল। ইচ্ছা হইল নদীর জীর্ণ পাড়ের মত ঝুপ করিয়া ভাঙিয়া জলে পড়িয়া যান।

কিন্তু তবু সেই জিনিষপত্র বাঁধিলেন, টিকিট কিনিলেন, এবং গাড়িও চড়িলেন।

একদিন শীতের সায়াহ্নে বাড়ির দ্বারে গিয়া উপস্থিত হইলেন। আশ্বিন মাসে শরতের প্রাতঃকালে দ্বারের কাছে বসিয়া বৈদ্যনাথ অনেক প্রবাসীকে বাড়ি ফিরিতে দেখিয়াছেন, এবং দীর্ঘশ্বাসের সহিত মনে মনে এই বিদেশ হইতে দেশে ফিরিবার সুখের জন্য লালায়িত হইয়াছেন—তখন আজিকার সন্ধ্যা স্বপ্নেরও অগম্য ছিল।

বাড়িতে প্রবেশ করিয়া প্রাঙ্গণের কাষ্ঠাসনে নির্ব্বোধের মত বসিয়া রহিলেন, অন্তঃপুরে গেলেন না। সর্ব্বপ্রথমে ঝি তাঁহাকে দেখিয়া আনন্দ কোলাহল বাধাইয়া দিল, ছেলেরা ছুটিয়া আসিল, গৃহিণী ডাকিয়া পাঠাইলেন।

বৈদ্যনাথের যেন একটা ঘোর ভাঙিয়া গেল, আবার যেন তাঁহার সেই পূর্ব্বসংসারে জাগিয়া উঠিলেন।

শুষ্কমুখে ম্লানহাস্য লইয়া একটা ছেলেকে কোলে করিয়া একটা ছেলের হাত ধরিয়া অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন।

তখন ঘরে প্রদীপ জ্বালান হইয়াছে এবং যদিও রাত হয় নাই তথাপি শীতের সন্ধ্যা, রাত্রির মত নিস্তব্ধ হইয়া আসিয়াছে।

বৈদ্যনাথ খানিকক্ষণ কিছু বলিলেন না, তাহার পর মৃদুস্বরে স্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করিলেন কেমন আছ?

স্ত্রী তাহার কোন উত্তর না দিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি হইল?"

বৈদ্যনাথ নিরুত্তরে কপালে আঘাত করিলেন। মোক্ষদার মুখ ভারি শক্ত হইয়া উঠিল।

ছেলেরা প্রকাণ্ড একটা অকল্যাণের ছায়া দেখিয়া আস্তে আস্তে উঠিয়া গেল। ঝির কাছে গিয়া বলিল, "সেই নাপিতের গল্প বল্।" বলিয়া বিছানায় শুইয়া পড়িল।

রাত হইতে লাগিল কিন্তু দুজনের মুখে একটি কথা নাই। বাড়ির মধ্যে কি একটা যেন ছম্‌ছম্‌ করিতে লাগিল এবং মোক্ষদার ঠোঁট দুটি ক্রমশই বজ্রের মত আঁটিয়া আসিল।

অনেকক্ষণ পরে মোক্ষদা কোন কথা না বলিয়া ধীরে ধীরে শয়নগৃহের মধ্যে প্রবেশ করিলেন এবং ভিতর হইতে দ্বার রুদ্ধ করিয়া দিলেন।

বৈদ্যনাথ চুপ করিয়া বাহিরে দাঁড়াইয়া রহিলেন। চৌকিদার প্রহর হাঁকিয়া গেল। শ্রান্ত পৃথিবী অকাতর নিদ্রায় মগ্ন হইয়া রহিল। আপনার আত্মীয় হইতে আরম্ভ করিয়া অনন্ত আকাশের

নক্ষত্র পর্য্যন্ত কেহই এই লাঞ্ছিত ভগ্ননিদ্র বৈদ্যনাথকে একটি কথা জিজ্ঞাসা করিল না।

অনেক রাত্রে, বোধ করি কোন স্বপ্ন হইতে জাগিয়া বৈদ্যনাথের বড় ছেলেটি শয্যা ছাড়িয়া আস্তে আস্তে বারেন্দায় আসিয়া ডাকিল, "বাবা!"

তখন তাহার বাবা সেখানে নাই। অপেক্ষাকৃত উর্দ্ধকণ্ঠে রুদ্ধদ্বারের বাহির হইতে ডাকিল, "বাবা!" কিন্তু কোন উত্তর পাইল না।

আবার ভয়ে ভয়ে বিছানায় গিয়া শয়ন করিল।

পূর্ব্বপ্রথানুসারে ঝি সকালবেলায় তামাক সাজিয়া তাঁহাকে খুঁজিল, কোথাও দেখিতে পাইল না। বেলা হইলে প্রতিবেশিগণ গৃহপ্রত্যাগত বান্ধবের খোঁজ লইতে আসিল, কিন্তু বৈদ্যনাথের সহিত সাক্ষাৎ হইল না।

দান প্রতিদান।

বড় গিন্নি যে কথাগুলা বলিয়া গেলেন, তাহার ধার যেমন তাহার বিষও তেমনি। যে হতভাগিনীর উপর প্রয়োগ করিয়া গেলেন, তাহার চিত্তপুত্তলী একেবারে জ্বলিয়া জ্বলিয়া লুটিতে লাগিল।

বিশেষত কথাগুলা তাহার স্বামীর উপর লক্ষ্য করিয়া বলা—এবং স্বামী রাধামুকুন্দ তখন রাত্রের আহার সমাপন করিয়া অনতিদূরে বসিয়া তাম্বুলের সহিত তাম্রকূটধূমসংযোগ করিয়া খাদ্য-পরিপাকে প্রবৃত্ত ছিলেন। কথাগুলো শ্রুতিপথে প্রবেশ করিয়া তাঁহার পরিপাকের যে বিশেষ ব্যাঘাত করিল এমন বোধ হইল না। অবিচলিত গাম্ভীর্য্যের সহিত তাম্রকূট নিঃশেষ করিয়া অভ্যাসমত যথাকালে তিনি শয়ন করিতে গেলেন।

রাসমণি যখন আসিয়া ক্রন্দনাবেগে শয্যাতল কম্পান্বিত করিয়া তুলিলেন তখন রাধামুকুন্দ জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি হইয়াছে ?"

রাসমণি উচ্ছ্বসিত স্বরে কহিলেন, "শোন নাই কি ?"

রাধামুকুন্দ। শুনিয়াছি। কিন্তু বৌঠাকরুণ একটা কথাও ত মিথ্যা বলেন নাই। আমি কি দাদার অন্নেই প্রতিপালিত নহি ? তোমার এই কাপড়চোপড় গহনাপত্র এ সমস্ত আমি কি আমার বাপের কড়ি হইতে আনিয়া দিয়াছি ? যে খাইতে

পরিতে দেয় সে যদি ছুটো কথা বলে, তাহাও খাওয়াপরায় সামিল করিয়া লইতে হয়।

"এমন খাওয়াপরায় কাজ কি ?"

"বাঁচিতে ত হইবে।"

"মরণ হইলেই ভাল হয়।"

"যতক্ষণ না হয় ততক্ষণ একটু ঘুমাইবার চেষ্টা কর, আরাম বোধ করিবে।"

বলিয়া রাধামুকুন্দ উপদেশ ও দৃষ্টান্তের সামঞ্জস্য সাধনে প্রবৃত্ত হইলেন।

রাধামুকুন্দ ও শশিভূষণ সহোদর ভাই নহে, নিতান্ত নিকট-সম্পর্কও নয়; প্রায় গ্রাম-সম্পর্ক বলিলেই হয়। কিন্তু প্রীতিবন্ধন সহোদর ভাইয়ের চেয়ে কিছু কম নহে। বড় গিন্নি ব্রজসুন্দরীর সেটা কিছু অসহ্য বোধ হইত। বিশেষত শশিভূষণ দেওয়া-থোওয়া সম্বন্ধে ছোটবৌয়ের অপেক্ষা নিজ স্ত্রীর প্রতি অধিক পক্ষপাত করিতেন না। বরঞ্চ যে জিনিষটা নিতান্ত একজোড়া না মিলিত, সেটা গৃহিণীকে বঞ্চিত করিয়া বৌকেই দিতেন। তাহা ছাড়া অনেক সময়ে তিনি স্ত্রীর অনুরোধ অপেক্ষা রাধা-মুকুন্দের পরামর্শের প্রতি বেশি নির্ভর করিতেন তাহার পরিচয় পাওয়া যায়। শশিভূষণ লোকটা নিতান্ত ঢিলাঢালা রকমের, তাই ঘরের কাজ এবং বিষয়কর্ম্মের সমস্ত ভার রাধামুকুন্দের উপরেই ছিল। বড় গিন্নির সর্ব্বদাই সন্দেহ রাধামুকুন্দ তলে তলে তাঁহার স্বামীকে বঞ্চনা করিবার আয়োজন করিতেছে—তাহার যতই প্রমাণ পাওয়া যাইত না, রাধার প্রতি তাঁহার বিদ্বেষ ততই বাড়িয়া উঠিত। মনে করিতেন, প্রমাণগুলোও অন্যায় করিয়া

তাঁহার বিরুদ্ধ-পক্ষ অবলম্বন করিয়াছে এইজন্য তিনি আবার প্রমাণের উপর রাগ করিয়া তাহাদের প্রতি নিরতিশয় অবজ্ঞা প্রকাশপূর্ব্বক নিজের সন্দেহকে ঘরে বসিয়া দ্বিগুণ দৃঢ় করিতেন। তাঁহার এই বহুযত্নপোষিত মানসিক আগুন আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাতের ন্যায় ভূমিকম্পসহকারে প্রায় মাঝে মাঝে উষ্ণ-ভাষায় উচ্ছ্বসিত হইত।

রাত্রে রাধামুকুন্দের ঘুমের ব্যাঘাত হইয়াছিল কি না বলিতে পারি না—কিন্তু পরদিন সকালে উঠিয়া তিনি বিরস মুখে শশিভূষণের নিকট গিয়া দাঁড়াইলেন। শশিভূষণ ব্যস্তসমস্ত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "বাধু, তোমায় এমন দেখিতেছি কেন? অসুখ হয় নাই ত!"

রাধামুকুন্দ মৃদুস্বরে ধীরে ধীরে কহিলেন, "দাদা, আর ত আমার এখানে থাকা হয় না।" এই বলিয়া গত সন্ধ্যাকালে বড় গৃহিণীর আক্রমণবৃত্তান্ত সংক্ষেপে এবং শান্তভাবে বর্ণনা করিয়া গেলেন।

শশিভূষণ হাসিয়া কহিলেন, "এই! এ ত নূতন কথা নহে। ও ত পরের ঘরের মেয়ে, সুযোগ পাইলেই দুটো কথা বলিবে, তাই বলিয়া কি ঘরের লোককে ছাড়িয়া যাইতে হইবে! কথা আমাকেও ত মাঝে মাঝে শুনিতে হয়, তাই বলিয়া ত সংসার ত্যাগ করিতে পারি না।"

রাধা কহিলেন, "মেয়েমানুষের কথা কি আর সহিতে পারি না, তবে পুরুষ হইয়া জন্মিলাম কি করিতে! কেবল ভয় হয়, তোমার সংসারে পাছে অশান্তি ঘটে।"

শশিভূষণ কহিলেন, "তুমি গেলে আমার কিসের শান্তি!"

আর অধিক কথা হইল না। রাধামুকুন্দ দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া চলিয়া গেলেন, তাঁহার হৃদয়ভার সমান রহিল।

এদিকে বড় গৃহিণীর আক্রোশ ক্রমশই বাড়িয়া উঠিতেছে। সহস্র উপলক্ষ্যে যখন-তখন তিনি রাধাকে খোঁটা দিতে পারিলে ছাড়েন না; মুহুর্মুহু বাক্যবাণে রাসমণির অন্তরাত্মাকে একপ্রকার শরশয্যাশায়ী করিয়া তুলিলেন। রাধা যদিও চুপচাপ করিয়া তামাক টানেন এবং স্ত্রীকে ক্রন্দনোন্মুখী দেখিবামাত্র চোখ বুজিয়া নাক ডাকাইতে আরম্ভ করেন, তবু ভাবে বোধ হয় তাঁহারও অসহ্য হইয়া আসিয়াছে।

কিন্তু শশিভূষণের সহিত তাঁহার সম্পর্ক ত আজিকার নহে—দুই ভাই যখন প্রাতঃকালে পান্তাভাত খাইয়া পাৎতাড়ি কক্ষে একসঙ্গে পাঠশালায় যাইত, উভয়ে যখন একসঙ্গে পরামর্শ করিয়া গুরুমহাশয়কে ফাঁকি দিয়া পাঠশালা হইতে পালাইয়া রাখাল-ছেলেদের সঙ্গে মিশিয়া নানাবিধ খেলা ফাঁদিত, এক বিছানায় শুইয়া স্তিমিত আলোকে মাসির নিকট গল্প শুনিত, ঘরের লোককে লুকাইয়া রাত্রে দূর পল্লীতে যাত্রা শুনিতে যাইত এবং প্রাতঃকালে ধরা পড়িয়া অপরাধ এবং শাস্তি উভয়ে সমান ভাগ করিয়া লইত—তখন কোথায় ছিল ব্রজসুন্দরী, কোথায় ছিল রাসমণি। জীবনের এতগুলো দিনকে কি একদিনে বিচ্ছিন্ন করিয়া চলিয়া যাওয়া যায়? কিন্তু এই বন্ধন যে স্বার্থ-পরতার বন্ধন, এই প্রগাঢ় প্রীতি যে পরান্ন-প্রত্যাশার সুচতুর ছদ্মবেশ, এরূপ সন্দেহ এরূপ আভাসমাত্র তাঁহার নিকট বিষতুল্য বোধ হইত, অতএব আর কিছুদিন এরূপ চলিলে কি হইত বলা যায় না। কিন্তু এমন সময়ে একটা গুরুতর ঘটনা ঘটিল।

যে সময়ের কথা বলিতেছি সে আজ চল্লিশ পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বেকার কথা। তখন নির্দ্দিষ্ট দিনে সূর্য্যাস্তের মধ্যে গবর্ণমেণ্টের খাজনা শোধ না করিলে জমীদারী-সম্পত্তি নিলাম হইয়া যাইত।

একদিন খবর আসিল, শশিভূষণের একমাত্র জমিদারী পরগণা এনাৎসাহী লাটের খাজনার দায়ে নিলাম হইয়া গেছে।

রাধামুকুন্দ তাঁহার স্বাভাবিক মৃদু প্রশান্তভাবে কহিলেন, "আমারই দোষ!" শশিভূষণ কহিলেন, "তোমার কিসের দোষ! তুমি ত খাজনা চালান দিয়াছিলে, পথে যদি ডাকাতে পড়িয়া লুটিয়া লয়, তুমি তাহার কি করিতে পার?"

দোষ কাহার এক্ষণে তাহা স্থির করিতে বসিয়া কোন ফল নাই —এখন সংসার চালাইতে হইবে। শশিভূষণ হঠাৎ যে কোন কাজকর্ম্মে হাত দিবেন সেরূপ তাঁহার স্বভাব ও শিক্ষা নহে। তিনি যেন ঘাটের বাঁধা সোপান হইতে পিছলিয়া এক মুহূর্ত্তে ডুব-জলে গিয়া পড়িলেন।

প্রথমেই তিনি স্ত্রীর গহনা বন্ধক দিতে উদ্যত হইলেন। রাধা-মুকুন্দ এক থলে টাকা সম্মুখে ফেলিয়া তাহাতে বাধা দিলেন। তিনি পূর্ব্বেই নিজ স্ত্রীর গহনা বন্ধক রাখিয়া যথোপযুক্ত অর্থ সংগ্রহ করিয়াছিলেন।

সংসারে একটা মহৎ পরিবর্ত্তন দেখা গেল, সম্পৎকালে গৃহিণী যাহাকে দূর করিবার সহস্র চেষ্টা করিয়াছিলেন, বিপৎকালে তাহাকে ব্যাকুলভাবে অবলম্বন করিয়া ধরিলেন। এই সময়ে দুই ভ্রাতার মধ্যে কাহার উপরে অধিক নির্ভর করা যাইতে পারে তাহা বুঝিয়া লইতে তাঁহার বিলম্ব হইল না।

কখনো যে রাধামুকুন্দের প্রতি তাঁহার তিলমাত্র বিদ্বেষভাব ছিল এখন আর তাহা প্রকাশ পায় না।

রাধামুকুন্দ পূর্ব্ব হইতেই স্বাধীন উপার্জ্জনের জন্য প্রস্তুত হইয়াছিল। নিকটবর্ত্তী সহরে সে মোক্তারি আরম্ভ করিয়া দিল। তখন মোক্তারি-ব্যবসায়ে আয়ের পথ এখনকার অপেক্ষা বিস্তৃত ছিল, এবং তীক্ষ্ণবুদ্ধি সাবধানী রাধামুকুন্দ প্রথম হইতেই পসার জমাইয়া তুলিল। ক্রমে সে জিলার অধিকাংশ বড় বড় জমিদারের কার্য্যভার গ্রহণ করিল।

এক্ষণে রাসমণির অবস্থা পূর্ব্বের ঠিক বিপরীত। এখন রাসমণির স্বামীর অন্নেই শশিভূষণ ও ব্রজসুন্দরী প্রতিপালিত। সে কথা লইয়া সে স্পষ্ট কোন গর্ব্ব করিয়াছিল কি না জানি না, কিন্তু কোন একদিন বোধ করি আভাসে ইঙ্গিতে ব্যবহারে সেই ভাব ব্যক্ত করিয়াছিল; বোধ করি, দেমাকের সহিত পা ফেলিয়া এবং হাত দুলাইয়া কোন একটা বিষয়ে বড় গিন্নির ইচ্ছার প্রতিকূলে নিজের মনোমত কাজ করিয়াছিল—কিন্তু সে কেবল একটি দিন মাত্র—তাহার পরদিন হইতে সে যেন পূর্ব্বের অপেক্ষাও নম্র হইয়া গেল। কারণ, কথাটা তাহার স্বামীর কানে গিয়াছিল; এবং রাত্রে রাধামুকুন্দ কি কি যুক্তি প্রয়োগ করিয়াছিল ঠিক বলিতে পারি না, পরদিন হইতে তাহার মুখে আর রা রহিল না, বড় গিন্নির দাসীর মত হইয়া রহিল;—শুনা যায়, রাধামুকুন্দ সেই রাত্রেই স্ত্রীকে তাহার পিতৃভবনে পাঠাইবার উদ্যোগ করিয়াছিল এবং সপ্তাহকাল তাহার মুখদর্শন করে নাই—অবশেষে ব্রজসুন্দরী ঠাকুরপোর হাতে ধরিয়া অনেক মিনতি করিয়া দম্পতির মিলনসাধন করাইয়া দেন, এবং

বলেন, "ছোটবৌ ত সেদিন আসিয়াছে, আর আমি কত কাল হইতে তোমাদের ঘরে আছি ভাই! তোমাতে আমাতে যে চিরকালের প্রিয়সম্পর্ক তাহার মর্য্যাদা ও কি বুঝিতে শিখিয়াছে? ও ছেলেমানুষ, উহাকে মাপ কর।"

রাধামুকুন্দ সংসারখরচের সমস্ত টাকা ব্রজসুন্দরীর হাতে আনিয়া দিতেন। রাসমণি নিজের আবশ্যক ব্যয় নিয়ম অনুসারে অথবা প্রার্থনা করিয়া ব্রজসুন্দরীর নিকট হইতে পাইতেন। গৃহমধ্যে বড় গিন্নির অবস্থা পূর্ব্বাপেক্ষা ভাল বই মন্দ নহে, কারণ পূর্ব্বেই বলিয়াছি শশিভূষণ স্নেহবশে এবং নানা বিবেচনায় রাসমণিকে বরঞ্চ অনেক সময় অধিক পক্ষপাত দেখাইতেন।

শশিভূষণের মুখে যদিও তাঁহার সহজ প্রফুল্ল হাস্যের বিরাম ছিল না কিন্তু গোপন অসুখে তিনি প্রতিদিন কৃশ হইয়া যাইতেছিলেন। আর কেহ ততটা লক্ষ্য করে নাই, কেবল দাদার মুখ দেখিয়া রাধার চক্ষে নিদ্রা ছিল না। অনেক সময়ে গভীর রাত্রে রাসমণি জাগ্রত হইয়া দেখিত, গভীর দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া অশান্তভাবে রাধা এপাশ ওপাশ করিতেছে।

রাধামুকুন্দ অনেক সময় শশিভূষণকে গিয়া আশ্বাস দিত—"তোমার কোন ভাবনা নাই দাদা! তোমার পৈতৃক বিষয় আমি ফিরাইয়া আনিব—কিছুতেই ছাড়িয়া দিব না। বেশি দিন দেরীও নাই।"

বাস্তবিক বেশি দিন দেরীও হইল না। শশিভূষণের সম্পত্তি যে ব্যক্তি নিলামে খরিদ করিয়াছিল, সে ব্যবসায়ী লোক, জমিদারীর কাজে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ। সম্মানের প্রত্যাশায় কিনিয়াছিল,

কিন্তু ঘর হইতে সদর খাজনা দিতে হইত—এক পয়সা মুনফা পাইত না! রাধামুকুন্দ বৎসরের মধ্যে দুই একবার লাঠিয়াল লইয়া লুটপাট করিয়া খাজনা আদায় করিয়া আনিত। প্রজারাও তাহার বাধ্য ছিল। ব্যবসাজীবী জমিদারকে তাহারা মনে মনে ঘৃণা করিত, এবং রাধামুকুন্দের পরামর্শে ও সাহায্যে সর্ব্বপ্রকারেই তাহার বিরুদ্ধাচরণ করিতে লাগিল।

অবশেষে সে বেচারা বিস্তর মকর্দ্দমা-মাম্‌লা করিয়া বরাবর অকৃতকার্য্য হইয়া এই ঝঞ্ঝাট হাত হইতে ঝাড়িয়া ফেলিবার জন্য উৎসুক হইয়া উঠিল। সামান্য মূল্যে রাধামুকুন্দ সেই পূর্ব্ব সম্পত্তি পুনর্ব্বার কিনিয়া লইলেন।

লেখায় যত অল্পদিন মনে হইল আসলে ততটা নয়। ইতিমধ্যে প্রায় দশ বৎসর উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে। দশ বৎসর পূর্ব্বে শশিভূষণ যৌবনের সর্ব্বপ্রান্তে প্রৌঢ় বয়সের আরম্ভভাগে ছিলেন কিন্তু এই আট দশ বৎসরের মধ্যেই তিনি যেন অন্তররুদ্ধ মানসিক উত্তাপের বাষ্পযানে চড়িয়া একেবারে সবেগে বার্দ্ধক্যের মাঝখানে আসিয়া পৌঁছিয়াছেন। পৈতৃক সম্পত্তি যখন ফিরিয়া পাইলেন, তখন কি জানি কেন আর তেমন প্রফুল্ল হইতে পারিলেন না। বহুদিন অব্যবহারে হৃদয়ের বীণাযন্ত্র বোধ করি বিকল হইয়া গিয়াছে, এখন সহস্র বার তার টানিয়া বাঁধিলেও ঢিলা হইয়া নামিয়া যায়—সে সুর আর কিছুতেই বাহির হয় না।

গ্রামের লোকেরা বিস্তর আনন্দ প্রকাশ করিল। তাহারা একটা ভোজের জন্য শশিভূষণকে গিয়া ধরিল। শশিভূষণ রাধামুকুন্দকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি বল ভাই?"

রাধামুকুন্দ বলিলেন, "অবশ্য, শুভদিনে আনন্দ করিতে হইবে বৈ কি!"

গ্রামে এমন ভোজ বহুকাল হয় নাই। গ্রামের ছোট বড় সকলেই খাইয়া গেল। ব্রাহ্মণেরা দক্ষিণা এবং দুঃখী-কাঙাল পয়সা ও কাপড় পাইয়া আশীর্ব্বাদ করিয়া চলিয়া গেল।

শীতের আরম্ভে গ্রামে তখন সময়টা খারাপ ছিল; তাহার উপরে শশিভূষণ পরিবেশনাদি বিবিধ কার্য্যে তিন চারিদিন বিস্তর পরিশ্রম এবং অনিয়ম করিয়াছিলেন, তাঁহার ভগ্ন শরীরে আর সহিল না—তিনি একেবারে শয্যাশায়ী হইয়া পড়িলেন। অন্যান্য দুরূহ উপসর্গের সহিত কম্প দিয়া জ্বর আসিল—বৈদ্য মাথা নাড়িয়া কহিল, "বড় শক্ত ব্যাধি।"

রাত্রি দুই তিন প্রহরের সময় রোগীর ঘর হইতে সকলকে বাহির করিয়া দিয়া রাধামুকুন্দ কহিলেন, "দাদা, তোমার অবর্ত্তমানে বিষয়ের অংশ কাহাকে কিরূপ দিব সেই উপদেশ দিয়া যাও।"

শশিভূষণ কহিলেন, "ভাই, আমার কি আছে যে কাহাকে দিব!"

রাধামুকুন্দ কহিলেন, "সবই ত তোমার।"

শশিভূষণ উত্তর দিলেন, "এককালে আমার ছিল, এখন আমার নহে।"

রাধামুকুন্দ অনেকক্ষণ চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। বসিয়া বসিয়া শয্যার এক অংশের চাদর দুই হাত দিয়া বারবার সমান করিয়া দিতে লাগিল। শশিভূষণের শ্বাসক্রিয়া কষ্টসাধ্য হইয়া উঠিল।

রাধামুকুন্দ তখন শয্যাপ্রান্তে উঠিয়া বসিয়া রোগীর পা দুটি ধরিয়া কহিল, "দাদা, আমি যে মহাপাতকের কাজ করিয়াছি, তাহা তোমাকে বলি, আর ত সময় নাই।"

শশিভূষণ কোন উত্তর করিলেন না—রাধামুকুন্দ বলিয়া গেলেন—সেই স্বাভাবিক শান্তভাব এবং ধীরে ধীরে কথা, কেবল মাঝে মাঝে এক একটা দীর্ঘনিশ্বাস উঠিতে লাগিল। "দাদা, আমার ভাল করিয়া বলিবার ক্ষমতা নাই। মনের যথার্থ যে ভাব সে অন্তর্যামী জানেন, আর পৃথিবীতে যদি কেহ বুঝিতে পারে ত, হয়ত, তুমি পারিবে। বালককাল হইতে তোমাতে আমাতে অন্তরে প্রভেদ ছিল না, কেবল বাহিরে প্রভেদ। কেবল এক প্রভেদ ছিল, তুমি ধনী আমি দরিদ্র। যখন দেখিলাম সেই সামান্য সূত্রে তোমাতে আমাতে বিচ্ছেদের সম্ভাবনা ক্রমশই গুরুতর হইয়া উঠিতেছে, তখন আমিই সে প্রভেদ লোপ করিয়াছিলাম। আমিই সদর খাজনা লুট করাইয়া তোমার সম্পত্তি নিলাম করাইয়াছিলাম।"

শশিভূষণ তিলমাত্র বিস্ময়ের ভাব প্রকাশ না করিয়া ঈষৎ হাসিয়া মৃদুস্বরে রুদ্ধ উচ্চারণে কহিলেন, "ভাই ভালই করিয়াছিলে। কিন্তু যেজন্য এত করিলে তাহা কি সিদ্ধ হইল? কাছে কি রাখিতে পারিলে? দয়াময় হরি।"—বলিয়া প্রশান্ত মৃদু হাস্যের উপরে দুই চক্ষু হইতে দুই বিন্দু অশ্রু গড়াইয়া পড়িল।

রাধামুকুন্দ তাঁহার দুই পায়ের নীচে মাথা রাখিয়া কহিল, "দাদা, আমাকে মাপ করিলে ত।"

শশিভূষণ কাছে ডাকিয়া তাহার হাত ধরিয়া কহিলেন, "ভাই তবে শোন। একথা আমি প্রথম হইতেই জানিতাম।

তুমি যাহাদের সহিত ষড়যন্ত্র করিয়াছিলে তাহারাই আমার নিকট প্রকাশ করিয়াছে। আমি তখন হইতে তোমাকে মাপ করিয়াছি।"

রাধামুকুন্দ দুই করতলে লজ্জিত মুখ লুকাইয়া কাঁদিতে লাগিল।

অনেকক্ষণ পরে কহিল—"দাদা মাপ যদি করিয়াছ তবে তোমার এই সম্পত্তি তুমি গ্রহণ কর। রাগ করিয়া ফিরাইয়া দিয়ো না।"

শশিভূষণ উত্তর দিতে পারিলেন না—তখন তাঁহার বাক্‌রোধ হইয়াছে—রাধামুকুন্দের মুখের দিকে অনিমেষে দৃষ্টি স্থাপিত করিয়া একবার দক্ষিণ হাত তুলিলেন। তাহাতে কি বুঝাইল বলিতে পারি না। বোধ করি রাধামুকুন্দ বুঝিয়া থাকিবে।

অনধিকার প্রবেশ।

একদা প্রাতঃকালে পথের ধারে দাঁড়াইয়া এক বালক আর-এক বালকের সহিত একটি অসমসাহসিক অনুষ্ঠান সম্বন্ধে বাজি রাখিয়াছিল। ঠাকুরবাড়ির মাধবী-বিতান হইতে ফুল তুলিয়া আনিতে পারিবে কি না ইহাই লইয়া তর্ক। একটি বালক বলিল পারিব, আর একটি বালক বলিল কখনই পারিবে না।

কাজটি শুনিতে সহজ অথচ করিতে কেন সহজ নহে তাহার বৃত্তান্ত আর একটু বিস্তারিত করিয়া বলা আবশ্যক।

পরলোকগত মাধবচন্দ্র তর্কবাচস্পতির বিধবা স্ত্রী জয়কালী দেবী এই রাধানাথ জীউর মন্দিরের অধিকারিণী।

জয়কালী দীর্ঘাকার, দৃঢ়শরীর, তীক্ষ্ণনাসা, প্রখরবুদ্ধি স্ত্রীলোক। তাঁহার স্বামী বর্ত্তমানে তাঁহাদের দেবত্র সম্পত্তি নষ্ট হইবার জো হইয়াছিল। বিধবা তাহার সমস্ত বাকি বকেয়া আদায়, সীমা সরহদ্দ স্থির এবং বহুকালের বেদখল উদ্ধার করিয়া সমস্ত পরিষ্কার করিয়াছিলেন। তাঁহার প্রাপ্য হইতে কেহ তাঁহাকে এক কড়ি বঞ্চিত করিতে পারিত না।

এই স্ত্রীলোকটির প্রকৃতির মধ্যে বহুল পরিমাণে পৌরুষের অংশ থাকাতে তাঁহার যথার্থ সঙ্গী কেহ ছিল না। স্ত্রীলোকেরা তাঁহাকে ভয় করিত। পরনিন্দা, ছোট কথা বা নাকীকান্না তাঁহার অসহ্য ছিল। পুরুষেরাও তাঁহাকে ভয় করিত; কারণ, পল্লিবাসী ভদ্রপুরুষদের চণ্ডীমণ্ডপগত অগাধ আলস্যকে তিনি

এক প্রকার নীরব ঘৃণাপূর্ণ তীক্ষ্ণ কটাক্ষের দ্বারা ধিক্কার করিয়া যাইতে পারিতেন যাহা তাঁহাদের স্থূল জড়ত্ব ভেদ করিয়াও অন্তরে প্রবেশ করিত।

প্রবলরূপে ঘৃণা করিবার এবং সে ঘৃণা প্রবলরূপে প্রকাশ করিবার অসাধারণ ক্ষমতা এই প্রৌঢ়া বিধবাটির ছিল। বিচারে যাহাকে অপরাধী করিতেন তাহাকে তিনি কথায় এবং বিনা কথায়, ভাবে এবং ভঙ্গীতে একেবারে দগ্ধ করিয়া যাইতে পারিতেন।

পল্লীর সমস্ত ক্রিয়াকর্ম্মে বিপদে সম্পদে তাঁহার নিরলস হস্ত ছিল। সর্ব্বত্রই তিনি নিজের একটি গৌরবের স্থান বিনা চেষ্টায় অতি সহজেই অধিকার করিয়া লইতেন। যেখানে তিনি উপস্থিত থাকিতেন সেখানে তিনিই যে, সকলের প্রধানপদে, সে সম্বন্ধে তাঁহার নিজের অথবা উপস্থিত কোন ব্যক্তির মনে কিছুমাত্র সন্দেহ থাকিত না।

রোগীর সেবায় তিনি সিদ্ধহস্ত ছিলেন, কিন্তু রোগী তাঁহাকে যমের মত ভয় করিত। পথ্য বা নিয়মের লেশমাত্র লঙ্ঘন হইলে তাঁহার ক্রোধানল রোগের তাপ অপেক্ষা রোগীকে অধিক উত্তপ্ত করিয়া তুলিত।

এই দীর্ঘাকার কঠিন বিধবাটি বিধাতার কঠোর নিয়মদণ্ডের ন্যায় পল্লীর মস্তকের উপর উদ্যত ছিলেন; কেহ তাঁহাকে ভালবাসিতে অথবা অবহেলা করিতে সাহাস করিত না। পল্লীর সকলের সঙ্গেই তাঁহার যোগ ছিল অথচ তাঁহার মত অত্যন্ত একাকিনী কেহ ছিল না।

বিধবা নিঃসন্তান ছিলেন। পিতৃমাতৃহীন দুইটি ভ্রাতুষ্পুত্র তাঁহার গৃহে মানুষ হইত। পুরুষ অভিভাবক অভাবে তাহাদের

যে কোন প্রকার শাসন ছিল না এবং স্নেহান্ধ পিসিমার আদরে তাহারা যে নষ্ট হইয়া যাইতেছিল এমন কথা কেহ বলিতে পারিত না। তাহাদের মধ্যে বড়টির বয়স আঠারো হইয়াছিল। মাঝে মাঝে তাহার বিবাহের প্রস্তাবও আসিত এবং পরিণয়বন্ধন সম্বন্ধে বালকটির চিত্তও উদাসীন ছিল না। কিন্তু পিসিমা তাহার সেই সুখবাসনায় একদিনের জন্যও প্রশ্রয় দেন নাই। তিনি কঠিন ভাবে বলিতেন, পুলিন আগে উপার্জ্জন করিতে আরম্ভ করুক্ তার পরে বধূ ঘরে আনিবে। পিসিমার মুখের সেই কঠোর বাক্যে প্রতিবেশিনীদের হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া যাইত।

ঠাকুরবাড়িটি জয়কালীর সর্ব্বাপেক্ষা যত্নের ধন ছিল। ঠাকুরের শয়ন বসন স্নানাহারের তিলমাত্র ত্রুটি হইতে পারিত না। পূজক ব্রাহ্মণ দুটি দেবতার অপেক্ষা এই একটি মানবীকে অনেক বেশি ভয় করিত। পূর্ব্বে এক সময় ছিল যখন দেবতার বরাদ্দ দেবতা পুরা পাইতেন না। কিন্তু আজ-কাল জয়কালীর শাসনে পূজার ষোলআনা অংশই ঠাকুরের ভোগে আসিতেছে।

বিধবার যত্নে ঠাকুরবাড়ির প্রাঙ্গণটি পরিষ্কার তক্‌তক্‌ করিতেছে—কোথাও একটি তৃণমাত্র নাই। একপার্শ্বে মঞ্চ অবলম্বন করিয়া মাধবীলতা উঠিয়াছে, তাহার শুষ্কপত্র পড়িবামাত্র জয়কালী তাহা তুলিয়া লইয়া বাহিরে ফেলিয়া দেন। ঠাকুরবাড়িতে পারিপাট্য পরিচ্ছন্নতা ও পবিত্রতার কিছুমাত্র ব্যাঘাত হইলে বিধবা তাহা সহ্য করিতে পারিতেন না। পাড়ার ছেলেরা পূর্ব্বে লুকাচুরি খেলা উপলক্ষে এই প্রাঙ্গণের প্রান্তে আসিয়া আশ্রয় গ্রহণ করিত এবং মধ্যে মধ্যে পাড়ার ছাগশিশু আসিয়া মাধবীলতার বল্কলাংশ কিছু কিছু ভক্ষণ করিয়া যাইত। এখন আর সে

সুযোগ নাই। পর্ব্বকাল ব্যতীত অন্য দিনে ছেলেরা প্রাঙ্গণে প্রবেশ করিতে পাইত না এবং ক্ষুধাতুর ছাগশিশুকে দণ্ডাঘাত খাইয়াই দ্বারের নিকট হইতে তারস্বরে আপন অজ-জননীকে আহ্বান করিতে করিতে ফিরিতে হইত।

অনাচারী ব্যক্তি পরমাত্মীয় হইলেও দেবালয়ের প্রাঙ্গণে প্রবেশ করিতে পাইত না। জয়কালীর একটি যবনকরপক্ক-কুক্কুটমাংসলোলুপ ভগিনীপতি আত্মীয়সন্দর্শনউপলক্ষে গ্রামে উপস্থিত হইয়া মন্দির-অঙ্গণে প্রবেশ করিবার উপক্রম করিয়াছিলেন, জয়কালী তাহাতে ত্বরিত ও তীব্র আপত্তি প্রকাশ করাতে সহোদরা ভগিনীর সহিত তাঁহার বিচ্ছেদ সম্ভাবনা ঘটিয়াছিল। এই দেবালয় সম্বন্ধে বিধবার এতই অতিরিক্ত অনাবশ্যক সতর্কতা ছিল যে, সাধারণের নিকট তাহা অনেকটা বাতুলতারূপে প্রতীয়মান হইত।

জয়কালী আর সর্ব্বত্রই কঠিন উন্নত স্বতন্ত্র, কেবল এই মন্দিরের সম্মুখে তিনি পরিপূর্ণভাবে আত্মসমর্পণ করিয়াছিলেন। এই বিগ্রহটির নিকট তিনি একান্তরূপে জননী পত্নী দাসী—ইহার কাছে তিনি সতর্ক, সুকোমল, সুন্দর এবং সম্পূর্ণ অবনম্র। এই প্রস্তরের মন্দির এবং প্রস্তরের মূর্ত্তিটি তাঁহার নিগূঢ় নারীস্বভাবের একমাত্র চরিতার্থতার বিষয় ছিল। ইহাই তাঁহার স্বামী পুত্র, তাঁহার সমস্ত সংসার।

ইহা হইতেই পাঠকেরা বুঁঝিবেন যে, যে বালকটি মন্দিরপ্রাঙ্গণ হইতে মাধবীমঞ্জরী আহরণ করিবার প্রতিজ্ঞা করিয়াছিল তাহার সাহসের সীমা ছিল না। সে জয়কালীর কনিষ্ঠ ভ্রাতুষ্পুত্র নলিন্। সে তাহার পিসিমাকে ভাল করিয়াই জানিত তথাপি তাহার

দুর্দ্দান্ত প্রকৃতি শাসনের বশ হয় নাই। যেখানে বিপদ সেখানেই তাহার একটা আকর্ষণ ছিল, এবং যেখানে শাসন সেখানেই লঙ্ঘন করিবার জন্য তাহার চিত্ত চঞ্চল হইয়া থাকিত! জনশ্রুতি আছে বাল্যকালে তাহার পিসিমার স্বভাবটিও এইরূপ ছিল।

জয়কালী তখন মাতৃস্নেহমিশ্রিত ভক্তির সহিত ঠাকুরের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া দালানে বসিয়া একমনে মালা জপিতেছিলেন।

বালকটি নিঃশব্দপদে পশ্চাৎ হইতে আসিয়া মাধবীতলায় দাঁড়াইল। দেখিল নিম্নশাখার ফুলগুলি পূজার জন্য নিঃশেষিত হইয়াছে। তখন অতি ধীরে ধীরে সাবধানে মঞ্চে আরোহণ করিল। উচ্চশাখায় দুটি একটি বিকচোন্মুখ কুঁড়ি দেখিয়া যেমন সে শরীর এবং বাহু প্রসারিত করিয়া তুলিতে যাইবে অমনি সেই প্রবল চেষ্টার ভরে জীর্ণ মঞ্চ সশব্দে ভাঙিয়া পড়িল। আশ্রিত লতা এবং বালক একত্রে ভূমিসাৎ হইল।

জয়কালী তাড়াতাড়ি ছুটিয়া আসিয়া তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্রটির কীর্ত্তি দেখিলেন। সবলে বাহু ধরিয়া তাহাকে মাটি হইতে তুলিলেন। আঘাত তাহার যথেষ্ট লাগিয়াছিল—কিন্তু সে আঘাতকে শাস্তি বলা যায় না, কারণ, তাহা অজ্ঞান জড়ের আঘাত। সেই জন্য পতিত বালকের ব্যথিত দেহে জয়কালীর সজ্ঞান শাস্তি মুহুর্মুহু সবলে বর্ষিত হইতে লাগিল। বালক একবিন্দু অশ্রুপাত না করিয়া নীরবে সহ্য করিল। তখন তাহার পিসিমা তাহাকে টানিয়া লইয়া ঘরের মধ্যে রুদ্ধ করিলেন। তাহার সেদিনকার বৈকালিক আহার নিষিদ্ধ হইল।

আহার বন্ধ হইল শুনিয়া দাসী মোক্ষদা কাতরকণ্ঠে ছলছলনেত্রে বালককে ক্ষমা করিতে অনুরোধ করিল। জয়কালীর

হৃদয় গলিল না। ঠাকুরাণীর অজ্ঞাতসারে গোপনে ক্ষুধিত বালককে যে কেহ খাদ্য দিবে বাড়িতে এমন দুঃসাহসিক কেহ ছিল না।

বিধবা মঞ্চসংস্কারের জন্য লোক ডাকিতে পাঠাইয়া পুনর্ব্বার মালা হস্তে দালানে আসিয়া বসিলেন। মোক্ষদা কিছুক্ষণ পরে সভয়ে নিকটে আসিয়া কহিল, ঠাকুরমা, কাকাবাবু ক্ষুধায় কাঁদিতেছেন তাঁহাকে কিছু দুধ আনিয়া দিব কি?

জয়কালী অবিচলিত মুখে কহিলেন, "না।" মোক্ষদা ফিরিয়া গেল। অদূরবর্ত্তী কুটীরের গৃহ হইতে নলিনের করুণ ক্রন্দন ক্রমে ক্রোধের গর্জ্জনে পরিণত হইয়া উঠিল—অবশেষে অনেকক্ষণ পরে তাহার কাতরতার শ্রান্ত উচ্ছ্বাস থাকিয়া থাকিয়া জপনিরতা পিসিমার কানে আসিয়া ধ্বনিত হইতে লাগিল।

নলিনের আর্ত্তকণ্ঠ যখন পরিশ্রান্ত ও মৌনপ্রায় হইয়া আসিয়াছে এমন সময়ে আর একটি জীবের ভীত কাতরধ্বনি নিকটে ধ্বনিত হইতে লাগিল এবং সেই সঙ্গে ধাবমান মনুষ্যের দূরবর্ত্তী চীৎকারশব্দ মিশ্রিত হইয়া মন্দিরের সম্মুখস্থ পথে একটা তুমুল কলরব উত্থিত হইল।

সহসা প্রাঙ্গণের মধ্যে একটা পদশব্দ শোনা গেল। জয়কালী পশ্চাতে ফিরিয়া দেখিলেন ভূপর্য্যন্ত মাধবীলতা আন্দোলিত হইতেছে।

সরোষকণ্ঠে ডাকিলেন, "নলিন্!"

কেহ উত্তর দিল না। বুঝিলেন অবাধ্য নলিন বন্দীশালা হইতে কোন ক্রমে পলায়ন করিয়া পুনরায় তাঁহাকে রাগাইতে আসিয়াছে!

তখন অত্যন্ত কঠিনভাবে অধরের উপরে ওষ্ঠ চাপিয়া বিধবা প্রাঙ্গণে নামিয়া আসিলেন।

লতাকুঞ্জের নিকট পুনরায় ডাকিলেন—নলিন্!

উত্তর পাইলেন না। শাখা তুলিয়া দেখিলেন, একটা অত্যন্ত মলিন শূকর প্রাণভয়ে ঘন পল্লবের মধ্যে আশ্রয় লইয়াছে।

যে লতাবিতান এই ইষ্টক প্রাচীরের মধ্যে বৃন্দাবিপিনের সংক্ষিপ্ত প্রতিরূপ; যাহার বিকসিত কুসুমমঞ্জরীর সৌরভ গোপাবৃন্দের সুগন্ধি নিশ্বাস স্মরণ করাইয়া দেয় এবং কালিন্দীতীরবর্ত্তী সুখবিহারের সৌন্দর্য্যস্বপ্ন জাগ্রত করিয়া তোলে—বিধবার সেই প্রাণাধিক যত্নের সুপবিত্র নন্দনভূমিতে অকস্মাৎ এই বীভৎস ব্যাপার ঘটিল।

পূজারি ব্রাহ্মণ লাঠিহস্তে তাড়া করিয়া আসিল।

জয়কালী তৎক্ষণাৎ নামিয়া আসিয়া তাহাকে নিষেধ করিলেন। এবং দ্রুতবেগে ভিতর হইতে মন্দিরের দ্বার রুদ্ধ করিয়া দিলেন।

অনতিকাল পরেই সুরাপানে উন্মত্ত ডোমের দল মন্দিরের দ্বারে উপস্থিত হইয়া তাহাদের বলির পশুর জন্য চীৎকার করিতে লাগিল।

জয়কালী রুদ্ধদ্বারের পশ্চাতে দাঁড়াইয়া কহিলেন, যা বেটারা ফিরে যা! আমার মন্দির অপবিত্র করিস্‌নে।

ডোমের দল ফিরিয়া গেল। জয়কালী ঠাকুরাণী যে তাঁহার রাধানাথ জীউর মন্দিরের মধ্যে অশুচি জন্তুকে আশ্রয় দিবেন ইহা তাহারা প্রায় প্রত্যক্ষ দেখিয়াও বিশ্বাস করিতে পারিল না।

গুপ্তধন।

১

অমাবস্যার নিশীথ রাত্রি। মৃত্যুঞ্জয় তান্ত্রিক মতে তাহাদের বহুকালের গৃহদেবতা জয়কালীর পূজায় বসিয়াছে। পূজা সমাধা করিয়া যখন উঠিল, তখন নিকটস্থ আমবাগান হইতে প্রত্যূষের প্রথম কাক ডাকিল।

মৃত্যুঞ্জয় পশ্চাতে ফিরিয়া চাহিয়া দেখিল মন্দিরের দ্বার রুদ্ধ রহিয়াছে। তখন সে একবার দেবীর চরণতলে মস্তক ঠেকাইয়া তাঁহার আসন সরাইয়া দিল। সেই আসনের নীচে হইতে একটি কাঁঠাল কাঠের বাক্স বাহির করিল। পৈতায় চাবি বাঁধা ছিল। সেই চাবি লাগাইয়া মৃত্যুঞ্জয় বাক্সটি খুলিল। খুলিবামাত্রেই চমকিয়া উঠিয়া মাথায় করাঘাত করিল।

মৃত্যুঞ্জয়ের অন্দরের বাগান প্রাচীর দিয়া ঘেরা। সেই বাগানের এক প্রান্তে বড় বড় গাছের ছায়ায় অন্ধকারে এই ছোট মন্দিরটি। মন্দিরে জয়কালীর মূর্ত্তি ছাড়া আর কিছুই নাই, তাহার প্রবেশ-দ্বার একটিমাত্র। মৃত্যুঞ্জয় বাক্সটি লইয়া অনেকক্ষণ নাড়াচাড়া করিয়া দেখিল। মৃত্যুঞ্জয় বাক্সটি খুলিবার পূর্ব্বে তাহা বন্ধই ছিল —কেহ তাহা ভাঙে নাই। মৃত্যুঞ্জয় দশ বার করিয়া প্রতিমার চারিদিকে ঘুরিয়া হাতড়াইয়া দেখিল—কিছুই পাইল না। পাগলের মত হইয়া মন্দিরের দ্বার খুলিয়া ফেলিল—তখন ভোরের আলো

ফুটিয়া উঠিতেছে। মন্দিরের চারিদিকে মৃত্যুঞ্জয় ঘুরিয়া ঘুরিয়া বৃথা আশ্বাসে খুঁজিয়া বেড়াইতে লাগিল।

সকালবেলায় আলোক যখন পরিস্ফুট হইয়া উঠিল, তখন সে বাহিরে চণ্ডীমণ্ডপে আসিয়া মাথায় হাত দিয়া বসিয়া ভাবিতে লাগিল। সমস্ত রাত্রি অনিদ্রার পর ক্লান্ত শরীরে একটু তন্দ্রা আসিয়াছে এমন সময়ে হঠাৎ চমকিয়া উঠিয়া শুনিল, জয় হোক্ বাবা।

সম্মুখে প্রাঙ্গণে এক জটাজুটধারী সন্ন্যাসী। মৃত্যুঞ্জয় ভক্তিভরে তাঁহাকে প্রণাম করিল। সন্ন্যাসী তাহার মাথায় হাত দিয়া আশীর্ব্বাদ করিয়া কহিলেন—বাবা, তুমি মনের মধ্যে বৃথা শোক করিতেছ।

শুনিয়া মৃত্যুঞ্জয় আশ্চর্য্য হইয়া উঠিল—কহিল,—আপনি অন্তর্য্যামী, নহিলে আমার শোক কেমন করিয়া বুঝিলেন? আমি ত কাহাকেও কিছু বলি নাই।

সন্ন্যাসী কহিলেন—বৎস, আমি বলিতেছি, তোমার যাহা হারাইয়াছে সেজন্য তুমি আনন্দ কর শোক করিয়ো না।

মৃত্যুঞ্জয় তাঁহার দুই পা জড়াইয়া ধরিয়া কহিল—আপনি তবে ত সমস্তই জানিয়াছেন—কেমন করিয়া হারাইয়াছে, কোথায় গেলে ফিরিয়া পাইব তাহা না বলিলে আমি আপনার চরণ ছাড়িব না।

সন্ন্যাসী কহিলেন,—আমি যদি তোমার অমঙ্গল কামনা করিতাম তবে বলিতাম। কিন্তু ভগবতী দয়া করিয়া যাহা হরণ করিয়াছেন সেজন্য শোক করিয়ো না।

মৃত্যুঞ্জয় সন্ন্যাসীকে প্রসন্ন করিবার জন্য সমস্ত দিন বিবিধ

উপচারে তাঁহার সেবা করিল। পর দিন প্রত্যুষে নিজের গোহাল হইতে লোটা ভরিয়া সফেন দুগ্ধ দুহিয়া লইয়া আসিয়া দেখিল সন্ন্যাসী নাই।

২

মৃত্যুঞ্জয় যখন শিশু ছিল, যখন তাহার পিতামহ হরিহর একদিন এই চণ্ডীমণ্ডপে বসিয়া তামাক খাইতেছিল, তখন এমনি করিয়াই একটি সন্ন্যাসী "জয় হোক্ বাবা" বলিয়া এই প্রাঙ্গণে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিলেন। হরিহর সেই সন্ন্যাসীকে কয়েকদিন বাড়িতে রাখিয়া বিধিমতে সেবার দ্বারা সন্তুষ্ট করিল।

বিদায়কালে সন্ন্যাসী যখন জিজ্ঞাসা করিলেন বৎস, তুমি কি চাও—হরিহর কহিল, বাবা যদি সন্তুষ্ট হইয়া থাকেন তবে আমার অবস্থাটা একবার শুনুন্। এককালে এই গ্রামে আমরা সকলের চেয়ে বর্দ্ধিষ্ণু ছিলাম। আমার প্রপিতামহ দূর হইতে কুলীন আনাইয়া তাঁহার এক কন্যার বিবাহ দিয়াছিলেন। তাঁহার সেই দৌহিত্রবংশ আমাদিগকেই ফাঁকি দিয়া আজকাল এই গ্রামে বড়লোক হইয়া উঠিয়াছে। আমাদের এখন অবস্থা ভাল নয়, কাজেই ইহাদের অহঙ্কার সহ্য করিয়া থাকি। কিন্তু আর সহ্য হয় না। কি করিলে আবার আমাদের বংশ বড় হইয়া উঠিবে সেই উপায় বলিয়া দিন, সেই আশীর্ব্বাদ করুন।

সন্ন্যাসী ঈষৎ হাসিয়া কহিলেন, বাবা, ছোট হইয়া সুখে থাক। বড় হইবার চেষ্টায় শ্রেয় দেখি না।

কিন্তু হরিহর তবু ছাড়িল না, বংশকে বড় করিবার জন্য সে সমস্ত স্বীকার করিতে রাজি আছে।

তখন সন্ন্যাসী তাঁহার ঝুলি হইতে কাপড়ে মোড়া একটি তুলট কাগজের লিখন বাহির করিলেন। কাগজখানি দীর্ঘ, কোষ্ঠীপত্রের মত গুটানো। সন্ন্যাসী সেটি মেজের উপরে খুলিয়া ধরিলেন। হরিহর দেখিল, তাহাতে নানাপ্রকার চক্রে নানা সাঙ্কেতিক চিহ্ন আঁকা, আর সকলের নিম্নে একটি প্রকাণ্ড ছড়া লেখা আছে তাহার আরম্ভটা এইরূপ :—

পায়ে ধরে সাধা,
রা নাহি দেয় রাধা ॥
শেষে দিল রা,
পাগোল ছাড় পা ॥
তেঁতুল বটের কোলে,
দক্ষিণে যাও চলে ॥
ঈশানকোণে ঈশানী,
কহে দিলাম নিশানী ॥ ইত্যাদি।

হরিহর কহিল, বাবা, কিছুই ত বুঝিলাম না!

সন্ন্যাসী কহিলেন—কাছে রাখিয়া দাও, দেবীর পূজা কর। তাঁহার প্রসাদে তোমার বংশে কেহ না কেহ এই লিখন অনুসারে ঐশ্বর্য্য পাইবে জগতে যাহার তুলনা নাই।

হরিহর মিনতি করিয়া কহিল, বাবা কি বুঝাইয়া দিবেন না?

সন্ন্যাসী কহিলেন—না। সাধনা দ্বারা বুঝিতে হইবে।

এমন সময় হরিহরের ছোট ভাই শঙ্কর আসিয়া উপস্থিত হইল। তাহাকে দেখিয়া হরিহর তাড়াতাড়ি লিখনটি লইবার চেষ্টা করিল। সন্ন্যাসী হাসিয়া কহিলেন, বড় হইবার পথের দুঃখ এখন হইতেই সুরু হইল। কিন্তু গোপন করিবার দরকার নাই। কারণ, ইহার

রহস্য কেবল একজন মাত্রই ভেদ করিতে পারিবে, হাজার চেষ্টা করিলেও আর কেহ তাহা পারিবে না। তোমাদের মধ্যে সেই লোকটি যে কে তাহা কেহ জানেনা। অতএব ইহা সকলের সম্মুখেই নির্ভয়ে খুলিয়া রাখিতে পার।

সন্ন্যাসী চলিয়া গেলেন। কিন্তু হরিহর এ কাগজটি লুকাইয়া না রাখিয়া থাকিতে পারিল না। পাছে আর কেহ ইহা হইতে লাভবান হয়, পাছে তাহার ছোট ভাই শঙ্কর ইহার ফলভোগ করিতে পারে, এই আশঙ্কায় হরিহর এই কাগজটি কাঁঠালকাঠের বাক্সে বন্ধ করিয়া তাহাদের গৃহদেবতা জয়কালীর আসনতলে লুকাইয়া রাখিল। প্রত্যেক অমাবস্যায় নিশীথ রাত্রে দেবীর পূজা সারিয়া সে একবার করিয়া সেই কাগজটি খুলিয়া দেখিত, যদি দেবী প্রসন্ন হইয়া তাহাকে অর্থ বুঝিবার শক্তি দেন্।

শঙ্কর কিছুদিন হইতে হরিহরকে মিনতি করিতে লাগিল, দাদা, আমাকে সেই কাগজটা একবার ভাল করিয়া দেখিতে দাও না!

হরিহর কহিল দূর পাগল! সে কাগজ কি আছে! বেটা ভণ্ডসন্ন্যাসী কাগজে কতকগুলা হিজিবিজি কাটিয়া আমাকে ফাঁকি দিয়া গেল—আমি সে পুড়াইয়া ফেলিয়াছি।

শঙ্কর চুপ করিয়া রহিল। হঠাৎ একদিন শঙ্করকে ঘরে দেখিতে পাওয়া গেল না। তাহার পর হইতে সে নিরুদ্দেশ।

হরিহরের অন্য সমস্ত কাজকর্ম্ম নষ্ট হইল—গুপ্ত ঐশ্বর্য্যের ধ্যান এক মুহূর্ত্ত সে ছাড়িতে পারিল না।

মৃত্যুকাল উপস্থিত হইলে সে তাহার বড় ছেলে শ্যামাপদকে এই সন্ন্যাসীদত্ত কাগজখানি দিয়া গেল।

এই কাগজ পাইয়া শ্যামাপদ চাকুরি ছাড়িয়া দিল। জয়কালীর পূজায়, আব একান্ত মনে এই লিখন পাঠের চর্চ্চায় তাহার জীবনটা যে কোন্‌দিক দিয়া কাটিয়া গেল তাহা বুঝিতে পারিল না।

মৃত্যুঞ্জয় শ্যামাপদর বড় ছেলে। পিতার মৃত্যুর পরে সে এই সন্ন্যাসীদত্ত গুপ্তলিখনের অধিকারী হইয়াছে। তাহার অবস্থা উত্তরোত্তর যতই হীন হইয়া আসিতে লাগিল, ততই অধিকতর আগ্রহের সহিত ঐ কাগজখানির প্রতি তাহার সমস্ত চিত্ত নিবিষ্ট হইল। এমন সময় গত অমাবস্যারাত্রে পূজার পর লিখনখানি আর দেখিতে পাইল না—সন্ন্যাসীও কোথায় অন্তর্দ্ধান করিল।

মৃত্যুঞ্জয় কহিল এই সন্ন্যাসীকে ছাড়া হইবে না। সমস্ত সন্ধান ইহার কাছ হইতেই মিলিবে।

এই বলিয়া সে ঘর ছাড়িয়া সন্ন্যাসীকে খুঁজিতে বাহির হইল। এক বৎসর পথে পথে কাটিয়া গেল।

৩

গ্রামের নাম ধারাগোল। সেখানে মৃত্যুঞ্জয় মুদির দোকানে বসিয়া তামাক খাইতেছিল আর অন্যমনস্ক হইয়া নানা কথা ভাবিতেছিল। কিছু দূরে মাঠের ধার দিয়া একজন সন্ন্যাসী চলিয়া গেল। প্রথমটা মৃত্যুঞ্জয়ের মনোযোগ আকৃষ্ট হইল না। একটু পরে হঠাৎ তাহার মনে হইল, যে লোকটা চলিয়া গেল এই ত সেই সন্ন্যাসী! তাড়াতাড়ি হুঁকাটা রাখিয়া মুদিকে সচকিত করিয়া একদৌড়ে সে দোকান হইতে বাহির হইয়া গেল। কিন্তু সে সন্ন্যাসীকে দেখা গেল না।

তখন সন্ধ্যা অন্ধকার হইয়া আসিয়াছে। অপরিচিত স্থানে

কোথায় যে সন্ন্যাসীর সন্ধান করিতে যাইবে তাহা সে ঠিক করিতে পারিল না। দোকানে ফিরিয়া আসিয়া মুদিকে জিজ্ঞাসা করিল, ঐ যে মস্ত বন দেখা যাইতেছে ওখানে কি আছে?

মুদি কহিল, এককালে ঐ বন সহর ছিল কিন্তু অগস্ত্য মুনির শাপে ওখানকার রাজা প্রজা সমস্তই মড়কে মরিয়াছে। লোকে বলে ওখানে অনেক ধনরত্ন আজও খুঁজিলে পাওয়া যায় কিন্তু দিনদুপরেও ঐ বনে সাহস করিয়া কেহ যাইতে পারে না। যে গেছে সে আর ফেরে নাই।

মৃত্যুঞ্জয়ের মন চঞ্চল হইয়া উঠিল। সমস্ত রাত্রি মুদির দোকানে মাদুরের উপর পড়িয়া মশার জ্বালায় সর্ব্বাঙ্গ চাপড়াইতে লাগিল আর ঐ বনের কথা, সন্ন্যাসীর কথা, সেই হারানো লিখনের কথা ভাবিতে থাকিল। বার বার পড়িয়া সেই লিখনটি মৃত্যুঞ্জয়ের প্রায় কণ্ঠস্থ হইয়া গিয়াছিল—তাই এই অনিদ্রাবস্থায় কেবলি তাহার মাথায় ঘুরিতে লাগিল—

পায়ে ধরে সাধা,
রা নাহি দেয় রাধা॥
শেষে দিল রা,
পাগোল ছাড় পা॥

মাথা গরম হইয়া উঠিল—কোনমতেই এই ক'টা ছত্র সে মন হইতে দূর করিতে পারিল না। অবশেষে ভোরের বেলায় যখন তাহার তন্দ্রা আসিল, তখন স্বপ্নে এই চারি ছত্রের অর্থ অতি সহজে তাহার নিকট প্রকাশ পাইল। "রা নাহি দেয় রাধা" অতএব "রাধা"র "রা" নাহি থাকিলে "ধা" রহিল—"শেষে দিল রা" অতএব

হইল "ধারা"—"পাগোল ছাড় পা"—"পাগোল"র "পা" ছাড়িলে "গোল" বাকি রহিল—অতএব সমস্তটা মিলিয়া হইল "ধারা গোল"—এই জায়গাটার নামত "ধারাগোল"ই বটে।

স্বপ্ন ভাঙিয়া মৃত্যুঞ্জয় লাফাইয়া উঠিল।

৪

সমস্ত দিন বনের মধ্যে ফিরিয়া সন্ধ্যাবেলায় বহুকষ্টে পথ খুঁজিয়া অনাহারে মৃতপ্রায় অবস্থায় মৃত্যুঞ্জয় গ্রামে ফিরিল।

পরদিন চাদরে চিঁড়া বাঁধিয়া পুনর্ব্বার সে বনের মধ্যে যাত্রা করিল। অপরাহ্ণে একটা দিঘির ধারে আসিয়া উপস্থিত হইল। দিঘির মাঝখানটা পরিষ্কার জল আর পাড়ের গায়ে গায়ে চারিদিকে পথ আর কুমুদের বন। পাথরে বাঁধান ঘাট ভাঙিয়া চুরিয়া পড়িয়াছে। সেইখানে জলে চিঁড়া ভিজাইয়া খাইয়া দিঘির চারিদিক প্রদক্ষিণ করিয়া দেখিতে লাগিল।

দিঘির পশ্চিম পাড়ির প্রান্তে হঠাৎ মৃত্যুঞ্জয় থমকিয়া দাঁড়াইল। দেখিল একটা তেঁতুলগাছকে বেষ্টন করিয়া প্রকাণ্ড বটগাছ উঠিয়াছে। তৎক্ষণাৎ তাহার মনে পড়িল—

তেঁতুল বটের কোলে,
দক্ষিণে যাও চলে॥

দক্ষিণে কিছুদূর যাইতেই ঘন জঙ্গলের মধ্যে আসিয়া পড়িল। সেখানে সে বেতঝাড় ভেদ করিয়া চলা একেবারে অসাধ্য। যাহা হউক, মৃত্যুঞ্জয় ঠিক করিল এই গাছটাকে কোনো মতে হারাইলে চলিবে না।

এই গাছের কাছে ফিরিয়া আসিবার সময় গাছের অন্তরাল

দিয়া অনতিদূরে একটা মন্দিরের চূড়া দেখা গেল। সেই দিকের প্রতি লক্ষ্য করিয়া মৃত্যুঞ্জয় এক ভাঙা মন্দিরের কাছে আসিয়া উপস্থিত হইল। দেখিল নিকটে একটা চুল্লি, পোড়াকাঠ আর ছাই পড়িয়া আছে। অতি সাবধানে মৃত্যুঞ্জয় ভগ্নদ্বার মন্দিরের মধ্যে উঁকি মারিল। সেখানে কোনো লোক নাই, প্রতিমা নাই, কেবল একটি কম্বল, কমণ্ডলু আর গেরুয়া উত্তরীয় পড়িয়া আছে।

তখন সন্ধ্যা আসন্ন হইয়া আসিয়াছে, গ্রাম বহুদূরে; অন্ধকারে বনের মধ্যে পথ সন্ধান করিয়া যাইতে পারিবে কি না সন্দেহ; তাই এই মন্দিরে মনুষ্যবসতির লক্ষণ দেখিয়া মৃত্যুঞ্জয় খুসি হইল। মন্দির হইতে একটি বৃহৎ প্রস্তরখণ্ড ভাঙিয়া দ্বারের কাছে পড়িয়াছিল; সেই পাথরের উপরে বসিয়া নতশিরে ভাবিতে ভাবিতে মৃত্যুঞ্জয় হঠাৎ পাথরের গায়ে কি যেন লেখা দেখিতে পাইল। ঝুঁকিয়া পড়িয়া দেখিল একটি চক্র আঁকা, তাহার মধ্যে কতক স্পষ্ট কতক লুপ্তপ্রায় ভাবে নিম্নলিখিত সাংকেতিক অক্ষর লেখা আছে:—

এই চক্রটি মৃত্যুঞ্জয়ের সুপরিচিত। কত অমাবস্যা রাত্রে পূজাগৃহে সুগন্ধ ধূপের ধূমে ঘৃতদীপালোকে তুলট কাগজে অঙ্কিত এই চক্রচিহ্নের উপরে ঝুঁকিয়া পড়িয়া রহস্যভেদ করিবার জন্য একাগ্রমনে সে দেবীর প্রসাদ যাচ্ঞা করিয়াছে। আজ অভীষ্ট

সিদ্ধির অত্যন্ত সন্নিকটে আসিয়া তাহার সর্ব্বাঙ্গ যেন কাঁপিতে লাগিল। পাছে তীরে আসিয়া তরী ডোবে, পাছে সামান্য একটা ভুলে তাহার সমস্ত নষ্ট হইয়া যায়, পাছে সেই সন্ন্যাসী পূর্ব্বে আসিয়া সমস্ত উদ্ধার করিয়া লইয়া গিয়া থাকে এই আশঙ্কায় তাহার বুকের মধ্যে তোলপাড় করিতে লাগিল। এখন যে তাহার কি কর্ত্তব্য তাহা সে ভাবিয়া পাইল না। তাহার মনে হইল সে হয় ত তাহার ঐশ্বর্য্যভাণ্ডারের ঠিক উপরেই বসিয়া আছে অথচ কিছুই জানিতে পাইতেছে না!

বসিয়া বসিয়া সে কালীনাম জপ করিতে লাগিল, সন্ধ্যার অন্ধকার নিবিড় হইয়া আসিল; ঝিল্লির ধ্বনিতে বনভূমি মুখর হইয়া উঠিল।

৫

এমন সময় কিছু দূর বনবনের মধ্যে অগ্নির দীপ্তি দেখা গেল। মৃত্যুঞ্জয় তাহার প্রস্তরাসন ছাড়িয়া উঠিয়া পড়িল আর সেই শিখা লক্ষ্য করিয়া চলিতে লাগিল।

বহুকষ্টে কিছুদূর গিয়া একটা অশথগাছের গুঁড়ির অন্তরাল হইতে স্পষ্ট দেখিতে পাইল তাহার সেই পরিচিত সন্ন্যাসী অগ্নির আলোকে সেই তুলটের লিখন মেলিয়া একটা কাঠি দিয়া ছাইয়ের উপরে এক মনে অঙ্ক কসিতেছে।

মৃত্যুঞ্জয়ের ঘরের সেই পৈতৃক তুলটের লিখন! আরে ভণ্ড, চোর! এই জন্যই সে মৃত্যুঞ্জয়কে শোক করিতে নিষেধ করিয়াছিল বটে!

সন্ন্যাসী একবার করিয়া অঙ্ক কসিতেছে, আর একটা মাপ-

কাঠি লইয়া জমি মাপিতেছে,—কিয়দ্দূর মাপিয়া হতাশ হইয়া ঘাড় নাড়িয়া পুনর্ব্বার আসিয়া অঙ্ক কসিতে প্রবৃত্ত হইতেছে।

এমন করিয়া রাত্রি যখন অবসানপ্রায়—যখন নিশান্তের শীত বায়ুতে বনস্পতির অগ্রশাখার পল্লবগুলি মর্ম্মরিত হইয়া উঠিল, তখন সন্ন্যাসী সেই লিখনপত্র গুটাইয়া লইয়া চলিয়া গেল।

মৃত্যুঞ্জয় কি করিবে ভাবিয়া পাইল না। ইহা সে নিশ্চয় বুঝিতে পারিল যে,সন্ন্যাসীর সাহায্য ব্যতীত এই লিখনের রহস্যভেদ করা তাহার সাধ্য হইবে না। লুব্ধ সন্ন্যাসী যে মৃত্যুঞ্জয়কে সাহায্য করিবে না তাহাও নিশ্চিত। অতএব গোপনে সন্ন্যাসীর প্রতি দৃষ্টি রাখা ছাড়া অন্য উপায় নাই, কিন্তু দিনের বেলায় গ্রামে না গেলে তাহার আহার মিলিবে না; অতএব অন্ততঃ কাল সকালে একবার গ্রামে যাওয়া আবশ্যক।

ভোরের দিকে অন্ধকার একটু ফিকা হইবামাত্র সে গাছ হইতে নামিয়া পড়িল। যেখানে সন্ন্যাসী ছাইয়ের মধ্যে আঁক কসিতেছিল সেখনে ভাল করিয়া দেখিল, কিছুই বুঝিল না। চতুর্দ্দিকে ঘুরিয়া দেখিল, অন্য বনখণ্ডের সঙ্গে কোনও প্রভেদ নাই।

বনতলের অন্ধকার ক্রমে যখন ক্ষীণ হইয়া আসিল তখন মৃত্যুঞ্জয় অতি সাবধানে চারিদিক দেখিতে দেখিতে গ্রামের উদ্দেশে চলিল। তাহার ভয় ছিল পাছে সন্ন্যাসী তাহাকে দেখিতে পায়।

যে দোকানে মৃত্যুঞ্জয় আশ্রয়গ্রহণ করিয়াছিল তাহার নিকটে একটি কায়স্থগৃহিণী ব্রতউদ্‌যাপন করিয়া সেদিন ব্রাহ্মণভোজন করাইতে প্রবৃত্ত ছিল। সেইখানে আজ মৃত্যুঞ্জয়ের আহার জুটিয়া গেল। কয়দিন আহারের কষ্টের পর আজ তাহার ভোজনটি

গুরুতর হইয়া উঠিল। সেই গুরু ভোজনের পর যেমন তামাকটি খাইয়া দোকানের মাদুরটিতে একবার গড়াইয়া লইবার ইচ্ছা করিল, অমনি গত রাত্রির অনিদ্রাকাতর মৃত্যুঞ্জয় ঘুমে আচ্ছন্ন হইয়া পড়িল।

মৃত্যুঞ্জয় স্থির করিয়াছিল, আজ সকাল সকাল আহারাদি করিয়া যথেষ্ট বেলা থাকিতে বাহির হইবে। ঠিক তাহার উল্টা হইল। যখন তাহার নিদ্রাভঙ্গ হইল তখন সূর্য্য অস্ত গিয়াছে। তবু মৃত্যুঞ্জয় দমিল না। অন্ধকারেই বনের মধ্যে সে প্রবেশ করিল।

দেখিতে দেখিতে রাত্রি ঘনীভূত হইয়া আসিল। গাছের ছায়ার মধ্যে দৃষ্টি আর চলে না, জঙ্গলের মধ্যে পথ অবরুদ্ধ হইয়া যায়। মৃত্যুঞ্জয় যে কোন্‌দিকে কোথায় যাইতেছে তাহা কিছুই ঠাহর পাইল না। রাত্রি যখন অবসান হইল তখন দেখিল সমস্ত রাত্রি সে বনের প্রান্তে একই জায়গায় ঘুরিয়া ঘুরিয়া বেড়াইয়াছে।

কাকের দল কা কা শব্দে গ্রামের দিকে উড়িল। এই শব্দ মৃত্যুঞ্জয়ের কানে ব্যঙ্গপূর্ণ ধিক্কারবাক্যের মত শুনাইল।

৬

গণনায় বারবার ভুল আর সেই ভুল সংশোধন করিতে করিতে অবশেষে সন্ন্যাসী সুড়ঙ্গের পথ আবিষ্কার করিয়াছেন। সুড়ঙ্গের মধ্যে মশাল লইয়া তিনি প্রবেশ করিলেন। বাঁধানো ভিত্তির গায়ে স্যাঁৎলা পড়িয়াছে—মাঝে মাঝে এক এক জায়গায় জল চুইয়া পড়িতেছে। স্থানে স্থানে কতকগুলা ভেক গায়ে গায়ে স্তূপাকার হইয়া নিদ্রা দিতেছে। এই পিছল পথ দিয়া কিছুদুর যাইতেই

সন্ন্যাসী দেখিলেন সম্মুখে দেয়াল উঠিয়াছে, পথ অবরুদ্ধ। কিছুই বুঝিতে পারিলেন না। দেয়ালের সর্ব্বত্র লৌহদণ্ড দিয়া সবলে আঘাত করিয়া দেখিলেন কোথাও ফাঁকা আওয়াজ দিতেছে না—কোথাও রন্ধ্র নাই—এই পথটার যে এইখানেই শেষ তাহা নিঃসন্দেহ।

আবার সেই কাগজ খুলিয়া মাথায় হাত দিয়া বসিয়া ভাবিতে লাগিলেন। সে রাত্রি এমনি করিয়া কাটিয়া গেল।

পরদিন পুনর্ব্বার গণনা সারিয়া সুরঙ্গে প্রবেশ করিলেন। সেদিন গুপ্তসঙ্কেত অনুসরণ পূর্ব্বক একটি বিশেষ স্থান হইতে পাথর খসাইয়া এক শাখাপথ আবিষ্কার করিলেন। সেই পথে চলিতে চলিতে আবার এক জায়গায় পথ অবরুদ্ধ হইয়া গেল।

অবশেষে পঞ্চম রাত্রে সুড়ঙ্গের মধ্যে প্রবেশ করিয়া সন্ন্যাসী বলিয়া উঠিলেন—আজ আমি পথ পাইয়াছি, আজ আর আমার কোন মতেই ভুল হইবে না।

পথ অত্যন্ত জটিল; তাহার শাখা প্রশাখার অন্ত নাই—কোথাও এত সঙ্কীর্ণ যে গুঁড়ি মারিয়া যাইতে হয়। বহুযত্নে মশাল ধরিয়া চলিতে চলিতে সন্ন্যাসী একটা গোলাকার ঘরের মত জায়গায় আসিয়া পৌঁছিলেন। সেই ঘরের মাঝখানে একটা বৃহৎ ইঁদারা। মশালের আলোকে সন্ন্যাসী তাহার তল দেখিতে পাইলেন না। ঘরের ছাদ হইতে একটা মোটা প্রকাণ্ড লৌহশৃঙ্খল ইঁদারার মধ্যে নামিয়া গেছে। সন্ন্যাসী প্রাণপণ বলে ঠেলিয়া এই শৃঙ্খলটাকে অল্প একটুখানি নাড়াইবামাত্র ঠং করিয়া একটা শব্দ ইঁদারার গহ্বর হইতে উত্থিত হইয়া ঘরময় প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল। সন্ন্যাসী উচ্চৈঃস্বরে বলিয়া উঠিলেন, পাইয়াছি!

যেমন বলা অমনি সেই ঘরের ভাঙা ভিত্তি হইতে একটা পাথর গড়াইয়া পড়িল আর সেই সঙ্গে আর একটা কি সচেতন পদার্থ ধপ্ করিয়া পড়িয়া চীৎকার করিয়া উঠিল। সন্ন্যাসী এই অকস্মাৎ শব্দে চমকিয়া উঠিতেই তাঁহার হাত হইতে মশাল পড়িয়া নিবিয়া গেল।

৭

সন্ন্যাসী জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি কে? কোন উত্তর পাইলেন না। তখন অন্ধকারে হাতড়াইতে গিয়া তাঁহার হাতে একটি মানুষের দেহ ঠেকিল। তাহাকে নাড়া দিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—কে তুমি?

কোনও উত্তর পাইলেন না। লোকটা অচেতন হইয়া গেছে।

তখন চকমকি ঠুকিয়া ঠুকিয়া সন্ন্যাসী অনেক কষ্টে মশাল ধরাইলেন। ইতিমধ্যে সেই লোকটা সংজ্ঞা প্রাপ্ত হইল আর উঠিবার চেষ্টা করিয়া বেদনায় আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিল।

সন্ন্যাসী কহিলেন, একি মৃত্যুঞ্জয় যে! তোমার এ মতি হইল কেন।

মৃত্যুঞ্জয় কহিল, বাবা মাপ কর। ভগবান আমাকে শাস্তি দিয়াছেন। তোমাকে পাথর ছুঁড়িয়া মারিতে গিয়া সাম্‌লাইতে পারি নাই—পিছলে পাথরসুদ্ধ আমি পড়িয়া গেছি। পাটা নিশ্চয় ভাঙিয়া গেছে।

সন্ন্যাসী কহিলেন, আমাকে মারিয়া তোমার কি লাভ হইত!

মৃত্যুঞ্জয় কহিল—লাভের কথা তুমি জিজ্ঞাসা করিতেছ! তুমি কিসের লোভে আমার পূজাঘর হইতে লিখনখানি চুরি করিয়া এই

সুড়ঙ্গের মধ্যে ঘুরিয়া বেড়াইতেছ! তুমি চোর, তুমি ভণ্ড! আমার পিতামহকে যে সন্ন্যাসী ঐ লিখনখানি দিয়াছিলেন তিনি বলিয়াছিলেন আমাদেরই বংশের কেহ এই লিখনের সংকেত বুঝিতে পারিবে। এই গুপ্ত ঐশ্বর্য্য আমাদেরই বংশের প্রাপ্য। তাই আমি এ কয়দিন না খাইয়া না ঘুমাইয়া ছায়ার মত তোমার পশ্চাতে ফিরিতেছি। আজ তুমি যখন বলিয়া উঠিলে "পাইয়াছি" তখন আমি আর থাকিতে পারিলাম না। আমি তোমার পশ্চাতে আসিয়া ভিতের ঐ গর্ত্তটার ভিতরে লুকাইয়া বসিয়াছিলাম। ওখান হইতে একটা পাথর খসাইয়া তোমাকে মারিতে গেলাম কিন্তু শরীর দুর্ব্বল, জায়গাটাও অত্যন্ত পিছল—তাই পড়িয়া গেছি—এখন তুমি আমাকে মারিয়া ফেল সেও ভাল—আমি যক্ষ হইয়া এই ধন আগ্‌লাইব—কিন্তু তুমি ইহা লইতে পারিবে না—কোন মতেই না! যদি লইতে চেষ্টা কর, আমি ব্রাহ্মণ তোমাকে অভিশাপ দিয়া এই কূপের মধ্যে ঝাঁপ দিয়া পড়িয়া আত্মহত্যা করিব। এ ধন তোমার ব্রহ্মরক্ত গোরক্ততুল্য হইবে—এ ধন তুমি কোনও দিন সুখে ভোগ করিতে পারিবে না। আমাদের পিতা পিতামহ এই ধনের উপরে সমস্ত মন রাখিয়া মরিয়াছেন—এই ধনের ধ্যান করিতে করিতে আমরা দরিদ্র হইয়াছি—এই ধনের সন্ধানে আমি বাড়িতে অনাথা স্ত্রী ও শিশুসন্তান ফেলিয়া আহার-নিদ্রা ছাড়িয়া লক্ষ্মীছাড়া পাগলের মত মাঠে ঘাটে ঘুরিয়া বেড়াইতেছি—এ ধন তুমি আমার চোখের সম্মুখে কখনও লইতে পারিবে না।

৮

সন্ন্যাসী কহিলেন—মৃত্যুঞ্জয়, তবে শোন! সমস্ত কথা তোমাকে বলি!

তুমি জান, তোমার পিতামহের এক কনিষ্ঠ সহোদর ছিল, তাহার নাম ছিল শঙ্কর।

মৃত্যুঞ্জয় কহিল—হাঁ, তিনি নিরুদ্দেশ হইয়া বাহির হইয়া গিয়াছেন।

সন্ন্যাসী কহিলেন—আমি সেই শঙ্কর।—মৃত্যুঞ্জয় হতাশ হইয়া দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিল। এতক্ষণ এই গুপ্তধনের উপর তাহার যে একমাত্র দাবী সে সাব্যস্ত করিয়া বসিয়াছিল তাহারই বংশের আত্মীয় আসিয়া সে দাবী নষ্ট করিয়া দিল।

শঙ্কর কহিলেন—দাদা সন্ন্যাসীর নিকট হইতে লিখন পাইয়া অবধি আমার কাছে তাহা বিধিমতে লুকাইবার চেষ্টা করিতেছিলেন কিন্তু তিনি যতই গোপন করিতে লাগিলেন, আমার ঔৎসুক্য ততই বাড়িয়া উঠিল। তিনি দেবীর আসনের নীচে বাক্সের মধ্যে ঐ লিখনখানি লুকাইয়া রাখিয়াছিলেন আমি তাহার সন্ধান পাইলাম আর দ্বিতীয় চাবি বানাইয়া প্রতিদিন অল্প অল্প করিয়া সমস্ত কাগজখানা নকল করিতে লাগিলাম। যেদিন নকল শেষ হইল সেই দিনই আমি এই ধনের সন্ধানে ঘর ছাড়িয়া বাহির হইলাম। আমারও ঘরে অনাথা স্ত্রী এবং একটি শিশুসন্তান ছিল। আজ তাহারা কেহ বাঁচিয়া নাই।

কত দেশ দেশান্তরে ভ্রমণ করিয়াছি তাহা বিস্তারিত বর্ণনার প্রয়োজন নাই। সন্ন্যাসীদত্ত এই লিখন নিশ্চয় কোন সন্ন্যাসী আমাকে বুঝাইয়া দিতে পারিবেন এই মনে করিয়া অনেক

সন্ন্যাসীর আমি সেবা করিয়াছি। অনেক ভণ্ড সন্ন্যাসী আমার ঐ কাগজের সন্ধান পাইয়া তাহা হরণ করিবারও চেষ্টা করিয়াছে। এইরূপে কত বৎসরের পর বৎসর কাটিয়াছে, আমার মনে এক মুহূর্ত্তের জন্যও সুখ ছিল না, শান্তি ছিল না।

অবশেষে পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত পুণ্যের বলে কুমায়ুন পর্ব্বতে বাবা স্বরূপানন্দ স্বামীর সঙ্গ পাইলাম। তিনি আমাকে কহিলেন, বাবা, তৃষ্ণা দূর কর তাহা হইলেই বিশ্বব্যাপী অক্ষয় সম্পদ আপনি তোমাকে ধরা দিবে!

তিনি আমার মনের দাহ জুড়াইয়া দিলেন। তাঁহার প্রসাদে আকাশের আলোক আর ধরণীর শ্যামলতা আমার কাছে রাজসম্পদ হইয়া উঠিল। একদিন পর্ব্বতের শিলাতলে শীতের সায়াহ্নে পরমহংস বাবার ধুনীতে আগুন জ্বলিতেছিল—সেই আগুনে আমার কাগজখানা সমর্পণ করিলাম। বাবা ঈষৎ একটু হাসিলেন। সে হাসির অর্থ তখন বুঝি নাই আজ বুঝিয়াছি। তিনি নিশ্চয় মনে মনে বলিয়াছিলেন, কাগজখানা ছাই করিয়া ফেলা সহজ কিন্তু বাসনা এত সহজে ভস্মসাৎ হয় না।

কাগজখানার যখন কোনও চিহ্ন রহিল না তখন আমার মনের চারিদিক হইতে একটা নাগপাশ বন্ধন যেন সম্পূর্ণরূপে খুলিয়া গেল। মুক্তির অপূর্ব্ব আনন্দে আমার চিত্ত পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। আমি মনে করিলাম এখন হইতে আমার আর কোনও ভয় নাই —আমি জগতে কিছুই চাহি না।

ইহার অনতিকাল পরে পরমহংস বাবার সঙ্গ হইতে চ্যুত হইলাম। তাঁহাকে অনেক খুঁজিলাম, কোথাও তাঁহার দেখা পাইলাম না।

আমি তখন সন্ন্যাসী হইয়া নিরাসক্তচিত্তে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিলাম। অনেক বৎসর কাটিয়া গেল—সেই লিখনের কথা প্রায় ভুলিয়াই গেলাম।

এমন সময় একদিন এই ধারাগোলের বনের মধ্যে প্রবেশ করিয়া একটি ভাঙা মন্দিরের মধ্যে আশ্রয় লইলাম। দুই এক দিন থাকিতে থাকিতে দেখিলাম, মন্দিরের ভিতে স্থানে স্থানে নানা প্রকার চিহ্ন আঁকা আছে। এই চিহ্নগুলি আমার পূর্ব্ব-পরিচিত।

এককালে বহুদিন যাহার সন্ধানে ফিরিয়াছিলাম তাহার যে নাগাল পাওয়া যাইতেছে তাহাতে আমার সন্দেহ রহিল না। আমি কহিলাম, এখানে আর থাকা হইবে না, এ বন ছাড়িয়া চলিলাম।

কিন্তু ছাড়িয়া যাওয়া ঘটিল না। মনে হইল, দেখাই যাক না, কি আছে! কৌতূহল একেবারে নিবৃত্ত করিয়া যাওয়াই ভাল। চিহ্নগুলা লইয়া অনেক আলোচনা করিলাম কোনও ফল হইল না। বারবার মনে হইতে লাগিল কেন সে কাগজখানা পুড়াইয়া ফেলিলাম! সেখানা রাখিলেই বা কি ক্ষতি ছিল!

তখন আবার আমার সেই জন্মগ্রামে গেলাম। আমাদের পৈতৃক ভিটার নিতান্ত দুরবস্থা দেখিয়া মনে করিলাম, আমি সন্ন্যাসী, আমার ধনরত্নে কোনও প্রয়োজন নাই, কিন্তু এই গরীবরা ত গৃহী, সেই গুপ্তসম্পদ ইহাদের জন্য উদ্ধার করিয়া দিলে তাহাতে দোষ নাই।

সেই লিখন কোথায় আছে জানিতাম, তাহা সংগ্রহ করা আমার পক্ষে কিছুমাত্র কঠিন হইল না।

তাহার পরে একটি বৎসর ধরিয়া এই কাগজখানা লইয়া এই নির্জ্জন বনের মধ্যে গণনা করিয়াছি আর সন্ধান করিয়াছি। মনে আর কোনও চিন্তা ছিল না। যত বারম্বার বাধা পাইতে লাগিলাম ততই উত্তরোত্তর আগ্রহ বাড়িয়া চলিল—উন্মত্তের মত অহোরাত্র এই এক অধ্যবসায়ে নিবিষ্ট রহিলাম।

ইতিমধ্যে কখন তুমি আমার অনুসরণ করিতেছ তাহা জানিতে পারি নাই। আমি সহজ অবস্থায় থাকিলে তুমি কখনই নিজেকে আমার কাছে গোপন রাখিতে পারিতে না কিন্তু আমি তন্ময় হইয়াছিলাম, বাহিরের ঘটনা আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করিত না।

তাহার পরে, যাহা খুঁজিতেছিলাম আজ এইমাত্র তাহা আবিষ্কার করিয়াছি। এখানে যাহা আছে পৃথিবীতে কোনও রাজরাজেশ্বরের ভাণ্ডারেও এত ধন নাই। আর একটিমাত্র সংকেত ভেদ করিলেই সেই ধন পাওয়া যাইবে।

এই সংকেতটিই সর্ব্বাপেক্ষা দুরূহ। কিন্তু এই সংকেতও আমি মনে মনে ভেদ করিয়াছি। সেইজন্যই "পাইয়াছি" বলিয়া মনের উল্লাসে চীৎকার করিয়া উঠিয়াছিলাম। যদি ইচ্ছা করি তবে আর এক দণ্ডের মধ্যে সেই স্বর্ণমাণিক্যের ভাণ্ডারের মাঝখানে গিয়া দাঁড়াইতে পারি!

মৃত্যুঞ্জয় শঙ্করের পা জড়াইয়া ধরিয়া কহিল, তুমি সন্ন্যাসী তোমার ত ধনের কোনও প্রয়োজন নাই—আমাকে সেই ভাণ্ডারের মধ্যে লইয়া যাও! আমাকে বঞ্চিত করিও না।

শঙ্কর কহিলেন—আজ আমার শেষবন্ধন ছিন্ন হইয়াছে! তুমি ঐ যে পাথর ফেলিয়া আমাকে মারিবার জন্য উদ্যত হইয়াছিলে

তাহার আঘাত আমার শরীরে লাগে নাই কিন্তু তাহা আমার মোহাবরণকে ভেদ করিয়াছে। তৃষ্ণার করালমূর্ত্তি আজ আমি দেখিলাম! আমার গুরু পরমহংসদেবের নিগূঢ় প্রশান্ত হাস্য এতদিন পরে আমার অন্তরের কল্যাণদীপে অনির্ব্বাণ আলোকশিখা জ্বালাইয়া তুলিল।

মৃত্যুঞ্জয় শঙ্করের পা ধরিয়া পুনরায় কাতরস্বরে কহিল,—তুমি মুক্ত পুরুষ, আমি মুক্ত নহি, আমি মুক্তি চাহি না, আমাকে এই ঐশ্বর্য্য হইতে বঞ্চিত করিতে পারিবে না।

সন্ন্যাসী কহিলেন,—বৎস, তবে তুমি তোমার এই লিখনটি লও! যদি ধন খুঁজিয়া লইতে পার তবে লইও।

এই বলিয়া তাঁহার যষ্টি ও লিখনপত্র মৃত্যুঞ্জয়ের কাছে রাখিয়া সন্ন্যাসী চলিয়া গেলেন। মৃত্যুঞ্জয় কহিল, আমাকে দয়া কর, আমাকে ফেলিয়া যাইও না—আমাকে দেখাইয়া দাও!

কোনো উত্তর পাইল না।

তখন মৃত্যুঞ্জয় যষ্টির উপর ভর করিয়া হাতড়াইয়া সুরঙ্গ হইতে বাহির হইবার চেষ্টা করিল কিন্তু পথ অত্যন্ত জটিল, গোলক-ধাঁদার মত বারবার বাধা পাইতে লাগিল। অবশেষে ঘুরিয়া ঘুরিয়া ক্লান্ত হইয়া এক জায়গায় শুইয়া পড়িল এবং নিদ্রা আসিতে বিলম্ব হইল না।

ঘুম হইতে যখন জাগিল তখন রাত্রি, কি দিন, কি কত বেলা তাহা জানিবার কোনও উপায় ছিল না। অত্যন্ত ক্ষুধা বোধ হইলে মৃত্যুঞ্জয় চাদরের প্রান্ত হইতে চিঁড়া খুলিয়া লইয়া খাইল। তাহার পর আর একবার হাতড়াইয়া সুরঙ্গ হইতে বাহির হইবার

পথ খুঁজিতে লাগিল। নানাস্থানে বাধা পাইয়া বসিয়া পড়িল। তখন চীৎকার করিয়া ডাকিল, ওগো সন্ন্যাসী তুমি কোথায়!

তাহার সেই ডাক সুরঙ্গের সমস্ত শাখাপ্রশাখা হইতে বারম্বার প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল। অনতিদূর হইতে উত্তর আসিল আমি তোমার নিকটেই আছি—কি চাও বল!

মৃত্যুঞ্জয় কাতরস্বরে কহিল,—কোথায় ধন আছে আমাকে দয়া করিয়া দেখইয়া দাও!

তখন আর কোনও সাড়া পাওয়া গেল না। মৃত্যুঞ্জয় বারম্বার ডাকিল, কোনও সাড়া পাইল না।

দণ্ডপ্রহরের দ্বারা অবিভক্ত এই ভূতলগত চিররাত্রির মধ্যে মৃত্যুঞ্জয় আর একবার ঘুমাইয়া লইল। ঘুম হইতে আবার সেই অন্ধকারের মধ্যে জাগিয়া উঠিল। চীৎকার করিয়া ডাকিল—ওগো আছ কি?

নিকট হইতেই উত্তর পাইল—এইখানেই আছি। কি চাও?

মৃত্যুঞ্জয় কহিল, আমি আর কিছু চাই না—আমাকে এই সুরঙ্গ হইতে উদ্ধার করিয়া লইয়া যাও।

সন্ন্যাসী জিজ্ঞাসা করিলেন—তুমি ধন চাও না?

মৃত্যুঞ্জয় কহিল—না, চাহি না।

তখন চকমকি ঠোকার শব্দ উঠিল এবং কিছুক্ষণ পরে আলো জ্বলিল। সন্ন্যাসী কহিলেন,—তবে এস মৃত্যুঞ্জয়, এই সুরঙ্গ হইতে বাহিরে যাই।

মৃত্যুঞ্জয় কাতর স্বরে কহিল,—বাবা, নিতান্তই কি সমস্ত ব্যর্থ হইবে? এত কষ্টের পরেও ধন কি পাইব না?

তৎক্ষণাৎ মশাল নিবিয়া গেল। মৃত্যুঞ্জয় কহিল, কি

নিষ্ঠুর!—বলিয়া সেইখানে বসিয়া পড়িয়া ভাবিতে লাগিল। সময়ের কোনও পরিমাণ নাই, অন্ধকারের কোনও অন্ত নাই। মৃত্যুঞ্জয়ের ইচ্ছা করিতে লাগিল তাহার সমস্ত শরীর-মনের বলে এই অন্ধকারটাকে ভাঙিয়া চূর্ণ করিয়া ফেলে। আলোক, আকাশ আর বিশ্বচ্ছবির বৈচিত্র্যের জন্য তাহার প্রাণ ব্যাকুল হইয়া উঠিল—কহিল, ওগো সন্ন্যাসী, ওগো নিষ্ঠুর সন্ন্যাসী, আমি ধন চাই না, আমাকে উদ্ধার কর।

সন্ন্যাসী কহিলেন,—ধন চাও না? তবে আমার হাত ধর। আমার সঙ্গে চল।

এবারে আর আলো জ্বলিল না। এক হাতে যষ্টি ও এক হাতে সন্ন্যাসীর উত্তরীয় ধরিয়া মৃত্যুঞ্জয় ধীরে ধীরে চলিতে লাগিল। বহুক্ষণ ধরিয়া অনেক আঁকাবাঁকা পথ দিয়া অনেক ঘুরিয়া ফিরিয়া এক জায়গায় আসিয়া সন্ন্যাসী কহিলেন,—দাঁড়াও।

মৃত্যুঞ্জয় দাঁড়াইল। তাহার পরে একটা মরিচা-পড়া লোহার দ্বার খোলার উৎকট শব্দ শোনা গেল। সন্ন্যাসী মৃত্যুঞ্জয়ের হাত ধরিয়া কহিলেন—এস।

মৃত্যুঞ্জয় অগ্রসর হইয়া যেন একটা ঘরে প্রবেশ করিল। তখন আবার চকমকি ঠোকার শব্দ শোনা গেল। কিছুক্ষণ পরে যখন মশাল জ্বলিয়া উঠিল তখন একি আশ্চর্য্য দৃশ্য! চারিদিকে দেয়ালের গায়ে মোটা মোটা সোনার পাত ভূগর্ভরুদ্ধ কঠিন সূর্য্যালোকপুঞ্জের মত স্তরে স্তরে সজ্জিত। মৃত্যুঞ্জয়ের চোখ দুটা জ্বলিতে লাগিল। সে পাগলের মত বলিয়া উঠিল—এ সোনা আমার—এ আমি কোন মতেই ফেলিয়া যাইতে পারিব না।

সন্ন্যাসী কহিলেন, আচ্ছা ফেলিয়া যাইও না; এই মশাল

রহিল—আর এই ছাতু, চিঁড়া আর বড় এক ঘটি জল রাখিয়া গেলাম।

দেখিতে দেখিতে সন্যাসী বাহির হইয়া আসিলেন আর এই স্বর্ণভাণ্ডারের লৌহদ্বারে কপাট পড়িল।

মৃত্যুঞ্জয় বার বার করিয়া এই স্বর্ণপুঞ্জ স্পর্শ করিয়া ঘরময় ঘুরিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল। ছোট ছোট স্বর্ণখণ্ড টানিয়া মেজের উপরে ফেলিতে লাগিল, কোলের উপর তুলিতে লাগিল, একটার উপর আর একটা আঘাত করিয়া শব্দ করিতে লাগিল, সর্ব্বাঙ্গের উপর বুলাইয়া তাহার স্পর্শ লইতে লাগিল। অবশেষে শ্রান্ত হইয়া সোনার পাত বিছাইয়া তাহার উপরে শয়ন করিয়া ঘুমাইয়া পড়িল।

জাগিয়া উঠিয়া দেখিল, চারিদিকে সোনা ঝক্‌ঝক্ করিতেছে। সোনা ছাড়া আর কিছুই নাই। মৃত্যুঞ্জয় ভাবিতে লাগিল—পৃথিবীর উপরে হয় ত এতক্ষণে প্রভাত হইয়াছে—সমস্ত জীবজন্তু আনন্দে জাগিয়া উঠিয়াছে।—তাহাদের বাড়িতে পুকুরের ধারের বাগান হইতে প্রভাতে যে একটি স্নিগ্ধগন্ধ উঠিত তাহাই কল্পনায় তাহার নাসিকায় যেন প্রবেশ করিতে লাগিল। সে যেন স্পষ্ট চোখে দেখিতে পাইল, পাতি হাঁসগুলি দুলিতে দুলিতে কলরব করিতে করিতে সকাল বেলায় পুকুরের জলের মধ্যে আসিয়া পড়িতেছে, আর বাড়ির ঝি বামা কোমরে কাপড় জড়াইয়া ঊর্দ্ধোত্থিত দক্ষিণ হস্তের উপর এক রাশি পিতল কাঁসার থালা বাটি লইয়া ঘাটে আনিয়া উপস্থিত করিতেছে।

মৃত্যুঞ্জয় দ্বারে আঘাত করিয়া ডাকিতে লাগিল—ওগো সন্যাসী ঠাকুর, আছ কি?

দ্বার খুলিয়া গেল। সন্ন্যাসী কহিলেন—কি চাও?

মৃত্যুঞ্জয় কহিল—আমি বাহিরে যাইতেই চাই—কিন্তু সঙ্গে এই সোনার ছুটো একটা পাতও কি লইয়া যাইতে পারিব না?

সন্ন্যাসী তাহার কোনও উত্তর না দিয়া নূতন মশাল জ্বালাইলেন—পূর্ণ কমণ্ডলু একটি রাখিলেন আর উত্তরীয় হইতে কয়েক মুষ্টি চিঁড়া মেজের উপর রাখিয়া বাহির হইয়া গেলেন। দ্বার বন্ধ হইয়া গেল।

মৃত্যুঞ্জয় পাত্‌লা একটা সোনার পাত লইয়া তাহা দোম্‌ড়াইয়া খণ্ড খণ্ড করিয়া ভাঙিয়া ফেলিল। সেই খণ্ড সোনাগুলাকে লইয়া ঘরের চারিদিকে লোষ্ট্রখণ্ডের মত ছড়াইতে লাগিল। কখনও বা দাঁত দিয়া দংশন করিয়া সোনার পাতের উপর দাগ করিয়া দিল। কখনও বা একটা সোনার পাত মাটিতে ফেলিয়া তাহার উপরে বারম্বার পদাঘাত করিতে লাগিল। মনে মনে বলিতে লাগিল, পৃথিবীতে এমন সম্রাট কয়জন আছে যাহারা সোনা লইয়া এমন করিয়া ফেলাছড়া করিতে পারে! মৃত্যুঞ্জয়ের যেন একটা প্রলয়ের রোখ চাপিয়া গেল। তাহার ইচ্ছা করিতে লাগিল, এই রাশীকৃত সোনাকে চূর্ণ করিয়া ধূলির মত সে ঝাঁটা দিয়া উড়াইয়া ফেলে—আর এইরূপে পৃথিবীর সমস্ত সুবর্ণলুব্ধ রাজা মহারাজাকে সে অবজ্ঞা করিতে পারে!

এমনি করিয়া যতক্ষণ পারিল মৃত্যুঞ্জয় সোনাগুলাকে লইয়া টানাটানি করিয়া শ্রান্তদেহে ঘুমাইয়া পড়িল। ঘুম হইতে উঠিয়া সে আবার তাহার চারিদিকে সেই সোনার স্তূপ দেখিতে লাগিল। সে তখন দ্বারে আঘাত করিয়া চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিল—ওগো সন্ন্যাসী, আমি এ সোনা চাই না—সোনা চাই না!

কিন্তু দ্বার খুলিল না। ডাকিতে ডাকিতে মৃত্যুঞ্জয়ের গলা ভাঙিয়া গেল কিন্তু দ্বার খুলিল না—এক একটা সোনার পিণ্ড লইয়া দ্বারের উপর ছুঁড়িয়া মারিতে লাগিল, কোনও ফল হইল না। মৃত্যুঞ্জয়ের বুক দমিয়া গেল—তবে আর কি সন্ন্যাসী আসিবে না! এই স্বর্ণকারাগারের মধ্যে তিলে তিলে পলে পলে শুকাইয়া মরিতে হইবে।

তখন সোনাগুলাকে দেখিয়া তাহার আতঙ্ক হইতে লাগিল। বিভীষিকার নিঃশব্দ কঠিন হাস্যের মত ঐ সোনার স্তূপ চারিদিকে স্থির হইয়া রহিয়াছে—তাহার মধ্যে স্পন্দন নাই, পরিবর্ত্তন নাই—মৃত্যুঞ্জয়ের যে হৃদয় এখন কাঁপিতেছে, ব্যাকুল হইতেছে, তাহার সঙ্গে উহাদের কোন সম্পর্ক নাই, বেদনার কোন সম্বন্ধ নাই। এই সোনার পিণ্ডগুলা আলোক চায় না, আকাশ চায় না, বাতাস চায় না, প্রাণ চায় না, মুক্তি চায় না। ইহারা এই চির অন্ধকারের মধ্যে চিরদিন উজ্জ্বল হইয়া কঠিন হইয়া রহিয়াছে!

পৃথিবীতে এখন কি গোধূলি আসিয়াছে? আহা, সেই গোধূলির স্বর্ণ! যে স্বর্ণ কেবল ক্ষণকালের জন্য চোখ জুড়াইয়া অন্ধকারের প্রান্তে কাঁদিয়া বিদায় লইয়া যায়! তাহার পরে কুটীরের প্রাঙ্গণতলে সন্ধ্যাতারা একদৃষ্টে চাহিয়া থাকে। গোয়ালে প্রদীপ জ্বালাইয়া বধূ ঘরের কোণে সন্ধ্যাদীপ স্থাপন করে। মন্দিরে আরতির ঘণ্টা বাজিয়া উঠে।

গ্রামের, ঘরের অতি ক্ষুদ্রতম, তুচ্ছতম ব্যাপার আজ মৃত্যুঞ্জয়ের কল্পনাদৃষ্টির কাছে উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। তাহাদের সেই যে ভোলা কুকুরটা ল্যাজে মাথায় এক হইয়া উঠানের প্রান্তে সন্ধ্যার পর ঘুমাইতে থাকিত সে কল্পনাও তাহাকে যেন ব্যথিত করিতে

লাগিল। ধারাগোল গ্রামে কয়দিন সে যে মুদির দোকানে আশ্রয় লইয়াছিল, সেই মুদি এতক্ষণ রাত্রে প্রদীপ নিবাইয়া দোকানে ঝাঁপ বন্ধ করিয়া ধীরে ধীরে গ্রামে বাড়িমুখে আহার করিতে চলিয়াছে, এই কথা স্মরণ করিয়া তাহার মনে হইতে লাগিল মুদি কি সুখেই আছে! আজ কি বার কে জানে! যদি রবিবার হয় তবে এতক্ষণে হাটের লোক যে যার আপন আপন বাড়ি ফিরিতেছে, সঙ্গচ্যুত সাথীকে উর্দ্ধস্বরে ডাক পাড়িতেছে, দল বাঁধিয়া খেয়া নৌকায় পার হইতেছে; মেঠো রাস্তা ধরিয়া, শস্যক্ষেত্রের আল বাহিয়া, পল্লীর শুষ্ক বংশপত্রখচিত অঙ্গন-পার্শ্ব দিয়া চাষীলোক হাতে দুটো একটা মাছ ঝুলাইয়া মাথায় একটা চুপড়ি লইয়া অন্ধকারে আকাশভরা তারার ক্ষীণালোকে গ্রামে গ্রামান্তরে চলিয়াছে।

ধরণীর উপরিতলে এই বিচিত্র বৃহৎ চিরচঞ্চল জীবনযাত্রার মধ্যে তুচ্ছতম দীনতম হইয়া নিজের জীবন মিশাইবার জন্য শত স্তর মৃত্তিকা ভেদ করিয়া তাহার কাছে লোকালয়ের আহ্বান আসিয়া পৌঁছিতে লাগিল। সেই জীবন, সেই আকাশ, সেই আলোক, পৃথিবীর সমস্ত মণিমাণিক্যের চেয়ে তাহার কাছে দুর্ম্মূল্য বোধ হইতে লাগিল। তাহার মনে হইতে লাগিল কেবল ক্ষণকালের জন্য একবার যদি আমার সেই শ্যামা জননী ধরিত্রীর ধূলিক্রোড়ে, সেই উন্মুক্ত আলোকিত নীলাম্বরের তলে, সেই তৃণপত্রের গন্ধ-বাসিত বাতাস বুক ভরিয়া একটি মাত্র শেষ নিশ্বাসে গ্রহণ করিয়া মরিতে পারি তাহা হইলেও জীবন সার্থক হয়।

এমন সময় দ্বার খুলিয়া গেল। সন্ন্যাসী ঘরে প্রবেশ করিয়া কহিলেন,—মৃত্যুঞ্জয়, কি চাও!

সে বলিয়া উঠিল আমি আর কিছুই চাই না—আমি এই সুড়ঙ্গ

হইতে, অন্ধকার হইতে, গোলকধাঁদা হইতে, এই সোনার গারদ হইতে বাহির হইতে চাই! আমি আলোক চাই, আকাশ চাই, মুক্তি চাই!

সন্ন্যাসী কহিলেন—এই সোনার ভাণ্ডারের চেয়ে মূল্যবান রত্ন-ভাণ্ডার এখানে আছে। একবার যাইবে না?

মৃত্যুঞ্জয় কহিল—না, যাইব না।

সন্ন্যাসী কহিলেন—একবার দেখিয়া আসিবার কৌতূহলও নাই?

মৃত্যুঞ্জয় কহিল—না, আমি দেখিতেও চাই না। আমাকে যদি কৌপীন পরিয়া ভিক্ষা করিয়া বেড়াইতে হয় তবু আমি এখানে এক মুহূর্ত্তও কাটাইতে ইচ্ছা করি না।

সন্ন্যাসী কহিলেন—আচ্ছা তবে এস।

মৃত্যুঞ্জয়ের হাত ধরিয়া সন্ন্যাসী তাহাকে সেই গভীর কূপের সম্মুখে লইয়া গেলেন। তাহার হাতে সেই লিখনপত্র দিয়া কহিলেন—এখানি লইয়া তুমি কি করিবে?

মৃত্যুঞ্জয় সে পত্রখানি টুকরা টুকরা করিয়া ছিঁড়িয়া কূপের মধ্যে নিক্ষেপ করিল।

মাষ্টার মশায়

১

অধর মজুমদারের বাপ সামান্য শিপ-সরকারী হইতে আরম্ভ করিয়া একটা বড় হৌসের মুচ্ছুদ্দিগিরি পর্য্যন্ত উঠিয়াছিলেন। অধর বাবু বাপের উপার্জ্জিত নগদ টাকা সুদে খাটাইতেছেন, তাঁহাকে আর নিজে খাটিতে হয় না। বাপ মাথায় সাদা ফেটা বাঁধিয়া পাল্কীতে করিয়া আপিসে যাইতেন, এদিকে তাঁহার ক্রিয়াকর্ম্ম দান ধ্যান যথেষ্ট ছিল। বিপদে আপদে অভাবে অনটনে সকল শ্রেণীর লোকেই যে তাঁহাকে আসিয়া ধরিয়া পড়িত ইহাই তিনি গর্ব্বের বিষয় মনে করিতেন।

অধর বাবু বড় বাড়ি ও গাড়ি জুড়ি করিয়াছেন, কিন্তু লোকের সঙ্গে আর তাঁহার সম্পর্ক নাই; কেবল টাকা ধারের দালাল আসিয়া তাঁহার বাঁধানো হুঁকায় তামাক টানিয়া যায় এবং অ্যাটর্নি আপিসের বাবুদের সঙ্গে ষ্ট্যাম্প দেওয়া দলিলের সর্ত্ত সম্বন্ধে আলোচনা হইয়া থাকে। তাঁহার সংসারে খরচপত্র সম্বন্ধে হিসাবের এমনি কষাকষি যে পাড়ার ফুটবল্ ক্লাবের নাছোড়বান্দা ছেলেরাও বহু চেষ্টায় তাঁহার তহবিলে দন্তস্ফুট করিতে পারে নাই।

এমন সময় তাঁহার ঘরকন্নার মধ্যে একটি অতিথির আগমন হইল। ছেলে হ'ল না, ছেলে হ'ল না করিতে করিতে অনেকদিন পরে তাঁহার একটি ছেলে জন্মিল। ছেলেটির চেহারা তাহার মাতার

ধরণের। বড় বড় চোখ, টিকলো নাক, রং রজনীগন্ধার পাপ্‌ড়ির মত,—যে দেখিল সেই বলিল আহা ছেলে ত নয় যেন কার্ত্তিক। অধর বাবুর অনুগত অনুচর রতিকান্ত বলিল, বড় ঘরের ছেলের যেমনটি হওয়া উচিত তেমনিই হইয়াছে।

ছেলেটির নাম হইল বেণুগোপাল। ইতিপূর্ব্বে অধর বাবুর স্ত্রী ননীবালা সংসারখরচ লইয়া স্বামীর বিরুদ্ধে নিজের মত তেমন জোর করিয়া কোনো দিন খাটান নাই। দুটো একটা সখের ব্যাপার অথবা লৌকিকতার অত্যাবশ্যক আয়োজন লইয়া মাঝে মাঝে বচসা হইয়াছে বটে কিন্তু শেষকালে স্বামীর কৃপণতার প্রতি অবজ্ঞা করিয়া নিঃশব্দে হার মানিয়াছেন।

এবার ননীবালাকে অধরলাল আঁটিয়া উঠিতে পারিলেন না; —বেণুগোপাল সম্বন্ধে তাঁহার হিসাব এক এক পা করিয়া হটিতে লাগিল। তাহার পায়ের মল, হাতের বালা, গলার হার, মাথার টুপি, তাহার দিশি বিলাতি নানা রকমের নানা রঙের সাজ সজ্জা সম্বন্ধে ননীবালা যাহা কিছু দাবী উত্থাপিত করিলেন সব ক'টাই তিনি কখনো নীরব অশ্রুপাতে কখনো সরব বাক্যবর্ষণে জিতিয়া লইলেন। বেণুগোপালের জন্য যাহা দরকার এবং যাহা দরকার নয় তাহা চাইই চাই—সেখানে শূন্য তহবিলের ওজর বা ভবিষ্যতের ফাঁকা আশ্বাস একদিনও খাটিল না।

২

বেণুগোপাল বাড়িয়া উঠিতে লাগিল। বেণুর জন্য খরচ করাটা অধরলালের অভ্যাস হইয়া আসিল। তাহার জন্য বেশি মাহিনা দিয়া অনেক পাস করা এক বুড়ো মাষ্টার রাখিলেন। এই

মাষ্টার বেণুকে মিষ্টভাষায় ও শিষ্টাচারে বশ করিবার অনেক চেষ্টা করিলেন—কিন্তু তিনি নাকি বরাবর ছাত্রদিগকে কড়া শাসনে চালাইয়া আজ পর্য্যন্ত মাষ্টারিমর্য্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখিয়া আসিয়াছেন সেইজন্য তাঁহার ভাষার মিষ্টতা ও আচারের শিষ্টতায় কেবলি বেসুর লাগিল—সেই শুষ্ক সাধনায় ছেলে ভুলিল না। ননীবালা অধরলালকে কহিলেন—ও তোমার কেমন মাষ্টার! ওকে দেখিলেই যে ছেলে অস্থির হইয়া উঠে। ওকে ছাড়াইয়া দাও।

বুড়া মাষ্টার বিদায় হইল। সেকালে মেয়ে যেমন স্বয়ম্বরা হইত তেমনি ননীবালার ছেলে স্বয়ং মাষ্টার বরণ করিতে বসিল—সে যাহাকে না বরিয়া লইবে তাহার সকল পাস ও সকল সার্টিফিকেট বৃথা।

এমনি সময়টিতে গায়ে একখানি ময়লা চাদর ও পায়ে ছেঁড়া ক্যাম্বিসের জুতা পরিয়া মাষ্টারির উমেদারিতে হরলাল আসিয়া জুটিল। তাহার বিধবা মা পরের বাড়িতে রাঁধিয়া ও ধান ভানিয়া তাহাকে মফস্বলের এণ্ট্রেন্সস্কুলে কোনো মতে এণ্ট্রেন্স পাস করাইয়াছে। এখন হরলাল কলিকাতায় কলেজে পড়িবে বলিয়া প্রাণপণ প্রতিজ্ঞা করিয়া বাহির হইয়াছে। অনাহারে তাহার মুখের নিম্নঅংশ শুকাইয়া ভারতবর্ষের কন্যাকুমারীর মত সরু হইয়া আসিয়াছে, কেবল মস্ত কপালটা হিমালয়ের মত প্রশস্ত হইয়া অত্যন্ত চোখে পড়িতেছে। মরুভূমির বালু হইতে সূর্য্যের আলো যেমন ঠিকরিয়া পড়ে তেমনি তাহার দুই চক্ষু হইতে দৈন্যের একটা অস্বাভাবিক দীপ্তি বাহির হইতেছে।

দরোয়ান জিজ্ঞাসা করিল, তুমি কি চাও? কাহাকে চাও?

—হরলাল ভয়ে ভয়ে বলিল—বাড়ির বাবুর সঙ্গে দেখা করিতে চাই।—দরোয়ান কহিল—দেখা হইবে না। তাহার উত্তরে হরলাল কি বলিবে ভাবিয়া না পাইয়া ইতস্তত করিতেছিল এমন সময় সাত বছরের ছেলে বেণুগোপাল বাগানে খেলা সারিয়া দেউড়িতে আসিয়া উপস্থিত হইল। দরোয়ান হরলালকে দ্বিধা করিতে দেখিয়া আবার কহিল—বাবু চলা যাও।

বেণুর হঠাৎ জিদ্ চড়িল—সে কহিল, নেহি জায়গা! বলিয়া সে হরলালের হাত ধরিয়া তাহাকে দোতলার বারান্দায় তাহার বাপের কাছে লইয়া হাজির করিল।

বাবু তখন দিবানিদ্রা সারিয়া জড়ালস ভাবে বারান্দায় বেতের কেদারায় চুপ চাপ বসিয়া পা দোলাইতেছিলেন ও বৃদ্ধ রতিকান্ত একটা কাঠের চৌকিতে আসন হইয়া বসিয়া ধীরে ধীরে তামাক টানিতেছিল। সেদিন এই সময়ে এই অবস্থায় দৈবক্রমে হরলালের মাষ্টারি বাহাল হইয়া গেল।

রতিকান্ত জিজ্ঞাসা করিল—আপনার পড়া কি পর্য্যন্ত?

হরলাল একটুখানি মুখ নীচু করিয়া কহিল—এণ্ট্রেন্স পাস করিয়াছি।

রতিকান্ত ভ্রূ তুলিয়া কহিল—শুধু এণ্ট্রেন্স পাস? আমি বলি কলেজে পড়িয়াছেন। আপনার বয়সও ত নেহাৎ কম দেখি না।

হরলাল চুপ করিয়া রহিল। আশ্রিত ও আশ্রয়প্রত্যাশীদিগকে সকল রকমে পীড়ন করাই রতিকান্তের প্রধান আনন্দ ছিল।

রতিকান্ত আদর করিয়া বেণুকে কোলের কাছে টানিয়া লইবার চেষ্টা করিয়া কহিল—কত এম-এ বি-এ আসিল ও গেল—

কাহাকেও পছন্দ হইল না—আর শেষকালে কি সোনাবাবু এণ্ট্রেন্স পাস করা মাষ্টারের কাছে পাড়িবেন ?

বেণু রতিকান্তের আদরের আকর্ষণ জোর করিয়া ছাড়াইয়া লইয়া কহিল—যাও! রতিকান্তকে বেণু কোনোমতেই সহ্য করিতে পারিত না, কিন্তু রতিও বেণুর এই অসহিষ্ণুতাকে তাহার বাল্যমাধুর্য্যের একটা লক্ষণ বলিয়া ইহাতে খুব আমোদ পাইবার চেষ্টা করিত, এবং তাহাকে সোনাবাবু চাঁদবাবু বলিয়া ক্ষ্যাপাইয়া আগুন করিয়া তুলিত।

হরলালের উমেদারী সফল হওয়া শক্ত হইয়া উঠিয়াছিল ;—সে মনে মনে ভাবিতেছিল এইবার কোনো সুযোগে চৌকি হইতে উঠিয়া বাহির হইতে পারিলে বাঁচা যায়। এমন সময়ে অধরলালের সহসা মনে হইল, এই ছোকরাটিকে নিতান্ত সামান্য মাহিনা দিলেও পাওয়া যাইবে। শেষকালে স্থির হইল হরলাল বাড়িতে থাকিবে, খাইবে ও পাঁচ টাকা করিয়া বেতন পাইবে। বাড়িতে রাখিয়া যেটুকু অতিরিক্ত দাক্ষিণ্য প্রকাশ করা হইবে তাহার বদলে অতিরিক্ত কাজ আদায় করিয়া লইলেই এটুকু সার্থক হইতে পারিবে।

৩

এবারে মাষ্টার টিকিয়া গেল। প্রথম হইতেই হরলালের সঙ্গে বেণুর এমনি জমিয়া গেল যেন তাহারা দুই ভাই। কলিকাতায় হরলালের আত্মীয় বন্ধু কেহই ছিল না—এই সুন্দর ছোট ছেলেটি তাহার সমস্ত হৃদয় জুড়িয়া বসিল। অভাগা হরলালের এমন করিয়া কোন মানুষকে ভালবাসিবার সুযোগ

ইতিপূর্ব্বে কথনো ঘটে নাই। কি করিলে তাহার অবস্থা ভাল হইবে এই আশায় সে বহুকষ্টে বই জোগাড় করিয়া কেবলমাত্র নিজের চেষ্টায় দিনরাত শুধু পড়া করিয়াছে। মাকে পরাধীন থাকিতে হইয়াছিল বলিয়া ছেলের শিশু বয়স কেবল সঙ্কোচেই কাটিয়াছে—নিষেধের গণ্ডী পার হইয়া দুষ্টামির দ্বারা নিজের বাল্য-প্রতাপকে জয়শালী করিবার সুখ সে কোনোদিন পায় নাই। সে কাহারো দলে ছিল না, সে আপনার ছেঁড়া বই ও ভাঙা শ্লেটের মাঝখানে একলাই ছিল। জগতে জন্মিয়া যে ছেলেকে শিশুকালেই নিস্তব্ধ ভালমানুষ হইতে হয়, তখন হইতেই মাতার দুঃখ ও নিজের অবস্থা যাহাকে সাবধানে বুঝিয়া চলিতে হয়, সম্পূর্ণ অবিবেচক হইবার স্বাধীনতা যাহার ভাগ্যে কোনদিন জোটে না, আমোদ করিয়া চঞ্চলতা করা বা দুঃখ পাইয়া কাঁদা, এদুটোই যাহাকে অন্য লোকের অসুবিধা ও বিরক্তির ভয়ে সমস্ত শিশুশক্তি প্রয়োগ করিয়া চাপিয়া যাইতে হয় তাহার মত করুণার পাত্র অথচ করুণা হইতে বঞ্চিত জগতে কে আছে!

সেই পৃথিবীর সকল মানুষের নীচে চাপা পড়া হরলাল নিজেও জানিত না তাহার মনের মধ্যে এত স্নেহের রস অবসরের অপেক্ষায় এমন করিয়া জমা হইয়া ছিল। বেণুর সঙ্গে খেলা করিয়া, তাহাকে পড়াইয়া, অসুখের সময় তাহার সেবা করিয়া হরলাল স্পষ্ট বুঝিতে পারিল নিজের অবস্থার উন্নতি করার চেয়েও মানুষের আর একটা জিনিষ আছে—সে যখন পাইয়া বসে তখন তাহার কাছে আর কিছুই লাগে না।

বেণুও হরলালকে পাইয়া বাঁচিল। কারণ, ঘরে সে একমাত্র ছেলে;—একটি অতি ছোট ও আর একটি তিন বছরের বোন

আছে—বেণু তাহাদিগকে সঙ্গদানের যোগ্যই মনে করে না। পাড়ার সমবয়সী ছেলের অভাব নাই—কিন্তু অধরলাল নিজের ঘরকে অত্যন্ত বড় ঘর বলিয়া নিজের মনে নিশ্চয় স্থির করিয়া রাখাতে মেলামেশা করিবার উপযুক্ত ছেলে বেণুর ভাগ্যে জুটিল না। কাজেই হরলাল তাহার একমাত্র সঙ্গী হইয়া উঠিল। অনুকূল অবস্থায় বেণুর যে সকল দৌরাত্ম্য দশজনের মধ্যে ভাগ হইয়া একরকম সহনযোগ্য হইতে পারিত তাহা সমস্তই একা হরলালকে বহিতে হইত। এই সমস্ত উপদ্রব প্রতিদিন সহ্য করিতে করিতে হরলালের স্নেহ আরো দৃঢ় হইয়া উঠিতে লাগিল। রতিকান্ত বলিতে লাগিল—আমাদের সোনাবাবুকে মাষ্টার মশায় মাটি করিতে বসিয়াছেন। অধরলালেরও মাঝে মাঝে মনে হইতে লাগিল মাষ্টারের সঙ্গে ছাত্রের সম্বন্ধটি ঠিক যেন যথোচিত হইতেছে না। কিন্তু হরলালকে বেণুর কাছ হইতে তফাৎ করে এমন সাধ্য এখন কাহার আছে!

৪

বেণুর বয়স এখন এগার। হরলাল এফ্ এ পাস করিয়া জলপানি পাইয়া তৃতীয় বার্ষিকে পড়িতেছে। ইতিমধ্যে কলেজে তাহার দুটি একটি বন্ধু যে জোটে নাই তাহা নহে কিন্তু ঐ এগারো বছরের ছেলেটাই তাহার সকল বন্ধুর সেরা। কলেজ হইতে ফিরিয়া বেণুকে লইয়া সে গোলদিঘি এবং কোনো দিন ইডেন গার্ডেনে বেড়াইতে যাইত। তাহাকে গ্রীক ইতিহাসের বীরপুরুষদের কাহিনী বলিত, তাহাকে স্কট্ ও ভিক্টর হ্যুগোর গল্প একটু একটু করিয়া বাংলায় শুনাইত—উচ্চৈঃস্বরে তাহার কাছে ইংরেজি

কবিতা আবৃত্তি করিয়া তাহা তর্জ্জমা করিয়া ব্যাখ্যা করিত, তাহার কাছে শেক্‌স্‌পীয়ারের জুলিয়স্‌ সীজার মানে করিয়া পড়িয়া তাহা হইতে অ্যাণ্টনির বক্তৃতা মুখস্থ করাইবার চেষ্টা করিত। ঐ একটুখানি বালক হরলালের হৃদয়-উদ্বোধনের পক্ষে যেন সোনার কাঠির মত হইয়া উঠিল। একলা বসিয়া যখন পড়া মুখস্থ করিত, তখন ইংরেজি সাহিত্য সে এমন করিয়া মনের মধ্যে গ্রহণ করে নাই, এখন সে ইতিহাস বিজ্ঞান সাহিত্য যাহা কিছু পড়ে তাহার মধ্যে কিছু রস পাইলেই সেটা আগে বেণুকে দিবার জন্য আগ্রহ বোধ করে এবং বেণুর মনে সেই আনন্দ সঞ্চার করিবার চেষ্টাতেই তাহার নিজের বুঝিবার শক্তি ও আনন্দের অধিকার যেন দুইগুণ বাড়িয়া যায়।

বেণু স্কুল হইতে আসিয়াই কোন মতে তাড়াতাড়ি জলপান সারিয়াই হরলালের কাছে যাইবার জন্য একেবারে ব্যস্ত হইয়া উঠিত, তাহার মা তাহাকে কোন ছুতায় কোন প্রলোভনে অন্তঃপুরে ধরিয়া রাখিতে পারিত না। ননীবালার ইহা ভাল লাগে নাই। তাহার মনে হইত, হরলাল নিজের চাকরি বজায় রাখিবার জন্যই ছেলেকে এত করিয়া বশ করিবার চেষ্টা করিতেছে। সে একদিন হরলালকে ডাকিয়া পর্দ্দার আড়াল হইতে বলিল—তুমি মাষ্টার, ছেলেকে কেবল সকালে এক ঘণ্টা বিকালে এক ঘণ্টা পড়াইবে—দিন রাত্রি উহার সঙ্গে লাগিয়া থাক কেন? আজকাল ও যে মা বাপ কাহাকেও মানে না। ও কেমন শিক্ষা পাইতেছে! আগে যে ছেলে মা বলিতে একেবারে নাচিয়া উঠিত আজ যে তাহাকে ডাকিয়া পাওয়া যায় না! বেণু আমার বড় ঘরের ছেলে, উহার সঙ্গে তোমার অত মাখামাখি কিসের জন্য!

সেদিন রতিকান্ত অধরবাবুর কাছে গল্প করিতেছিল যে, তাহার জানা তিন চার জন লোক, বড়মানুষের ছেলের মাষ্টারি করিতে আসিয়া ছেলের মন এমন করিয়া বশ করিয়া লইয়াছে যে, ছেলে বিষয়ের অধিকারী হইলে তাহারাই সর্ব্বেসর্ব্বা হইয়া ছেলেকে স্বেচ্ছামত চালাইয়াছে। হরলালের প্রতিই ইসারা করিয়া যে এ সকল কথা বলা হইতেছিল তাহা হরলালের বুঝিতে বাকি ছিল না। তবু সে চুপ করিয়া সমস্ত সহ্য করিয়া গিয়াছিল। কিন্তু আজ বেণুব মার কথা শুনিয়া তাহাব বুক ভাঙিয়া গেল। সে বুঝিতে পারিল বড় মানুষের ঘরে মাষ্টারের পদবীটা কি। গোয়াল ঘরে ছেলেকে দুধ যোগাইবার যেমন গোরু আছে তেমনি তাহাকে বিদ্যা যোগাইবার একটা মাষ্টারও রাখা হইয়াছে—ছাত্রের সঙ্গে স্নেহপূর্ণ আত্মীয়তার সম্বন্ধ স্থাপন এত বড় একটা স্পর্দ্ধা যে, বাড়ির চাকর হইতে গৃহিণী পর্য্যন্ত কেহই তাহা সহ্য করিতে পারে না, এবং সকলেই সেটাকে স্বার্থসাধনের একটা চাতুরী বলিবাই জানে।

হরলাল কম্পিত কণ্ঠে বলিল, মা, বেণুকে আমি কেবল পড়াইব, তাহার সঙ্গে আমার আর কোনো সম্পর্ক থাকিবে না।

সেদিন বিকালে বেণুর সঙ্গে তাহার খেলিবার সময়ে হরলাল কলেজ হইতে ফিরিলই না। কেমন করিয়া রাস্তায় রাস্তায় ঘুরিয়া সে সময় কাটাইল তাহা সেই জানে। সন্ধ্যা হইলে যখন সে পড়াইতে আসিল তখন বেণু মুখভার করিয়া রহিল। হরলাল তাহার অনুপস্থিতির কোনো জবাবদিহি না করিয়া পড়াইয়া গেল—সেদিন পড়া সুবিধামত হইলই না।

হরলাল প্রতিদিন রাত্রি থাকিতে উঠিয়া তাহার ঘরে বসিয়া

পড়া করিত। বেণু সকালে উঠিয়াই মুখ ধুইয়া তাঁহার কাছে ছুটিয়া যাইত। বাগানে বাঁধান চৌবাচ্চায় মাছ ছিল তাহাদিগকে মুড়ি খাওয়ানো ইহাদের এক কাজ ছিল। বাগানের এক কোণে কতকগুলা পাথর সাজাইয়া, ছোট ছোট রাস্তা ও ছোট গেট ও বেড়া তৈরি করিয়া বেণু বালখিল্য ঋষির আশ্রমের উপযুক্ত একটি অতি ছোট বাগান বসাইয়াছিল। সে বাগানে মালীর কোনো অধিকার ছিল না। সকালে এই বাগানের চর্চ্চা করা তাহাদের দ্বিতীয় কাজ। তাহার পরে রৌদ্র বেশি হইলে বাড়ি ফিরিয়া বেণু হরলালের কাছে পড়িতে বসিত। কাল সায়াহ্নে যে গল্পের অংশ শোনা হয় নাই সেইটে শুনিবার জন্য আজ বেণু যথাসাধ্য ভোরে উঠিয়া বাহিরে ছুটিয়া আসিয়াছিল। সে মনে করিয়াছিল সকালে ওঠায় সে আজ মাষ্টার মশায়কে বুঝি জিতিয়াছে। ঘরে আসিয়া দেখিল মাষ্টার মশায় নাই। দরোয়ানকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিল মাষ্টার মশায় বাহির হইয়া গিয়াছেন।

সেদিনও সকালে পড়ার সময় বেণু ক্ষুদ্র হৃদয়টুকুর বেদনা লইয়া মুখ গম্ভীর করিয়া রহিল। সকালবেলায় হরলাল কেন যে বাহির হইয়া গিয়াছিল তাহা জিজ্ঞাসাও করিল না। হরলাল বেণুর মুখের দিকে না চাহিয়া বইয়ের পাতার উপর চোখ রাখিয়া পড়াইয়া গেল। বেণু বাড়ির ভিতরে তাহার মার কাছে যখন খাইতে বসিল, তখন তাহার মা জিজ্ঞাসা করিলেন—কাল বিকাল হইতে তোর কি হইয়াছে বল্ দেখি! মুখ হাঁড়ি করিয়া আছিস্ কেন—ভাল করিয়া খাইতেছিস্ না—ব্যাপারখানা কি!

বেণু কোনো উত্তর করিল না। আহারের পর মা তাহাকে কাছে টানিয়া আনিয়া তাহার গায়ে হাত বুলাইয়া অনেক আদর

করিয়া যখন তাহাকে বারবার প্রশ্ন করিতে লাগিলেন তখন সে আর থাকিতে পারিল না—ফুঁপাইয়া কাঁদিয়া উঠিল। বলিল—মাষ্টার মশায়—

মা কহিলেন—মাষ্টার মশায় কি ?

বেণু বলিতে পারিল না মাষ্টার মশায় কি করিয়াছেন। কি যে অভিযোগ তাহা ভাষায় ব্যক্ত করা কঠিন।

ননীবালা কহিলেন—মাষ্টার মশায় বুঝি তোর মার নামে তোর কাছে লাগাইয়াছেন !

সে কথার কোনো অর্থ বুঝিতে না পারিয়া বেণু উত্তর না করিয়া চলিয়া গেল।

৫

ইতিমধ্যে বাড়িতে অধরবাবুর কতকগুলা কাপড় চোপড় চুরি হইয়া গেল। পুলিসকে খবর দেওয়া হইল। পুলিস খানাতল্লাসীতে হরলালেরও বাক্স সন্ধান করিতে ছাড়িল না। রতিকান্ত নিতান্তই নিরীহভাবে বলিল, যে লোক লইয়াছে সে কি আর মাল বাক্সর মধ্যে রাখিয়াছে ?

মালের কোনো কিনারা হইল না। এরূপ লোকসান অধরলালের পক্ষে অসহ্য। তিনি পৃথিবীসুদ্ধ লোকের উপর চটিয়া উঠিলেন। রতিকান্ত কহিল, বাড়িতে অনেক লোক রহিয়াছে, কাহাকেই বা দোষ দিবেন, কাহাকেই বা সন্দেহ করিবেন ? যাহার যখন খুসি আসিতেছে যাইতেছে।

অধরলাল মাষ্টারকে ডাকাইয়া বলিলেন, দেখ হরলাল, তোমাদের কাহাকেও বাড়িতে রাখা আমার পক্ষে সুবিধা হইবে

না। এখন হইতে তুমি আলাদা বাসায় থাকিয়া বেণুকে ঠিক সময়মত পড়াইয়া যাইবে এই হইলেই ভাল হয়—না হয় আমি তোমার দুইটাকা মাইনে বৃদ্ধি করিয়া দিতে রাজি আছি।

রতিকান্ত তামাক টানিতে টানিতে বলিল—এ ত অতি ভাল কথা—উভয়পক্ষেই ভাল।

হরলাল মুখ নীচু করিয়া শুনিল। তখন কিছু বলিতে পারিল না। ঘরে আসিয়া অধরবাবুকে চিঠি লিখিয়া পাঠাইল, নানা কারণে বেণুকে পড়ানো তাহার পক্ষে সুবিধা হইবে না—অতএব আজই সে বিদায় গ্রহণ করিবার জন্য প্রস্তুত হইয়াছে।

সেদিন বেণু স্কুল হইতে ফিরিয়া আসিয়া দেখিল মাষ্টার মশায়ের ঘর শূন্য। তাঁহার সেই ভগ্নপ্রায় টিনের প্যাট্‌রাটিও নাই। দড়ির উপর তাঁহার চাদর ও গামছা ঝুলিত সে দড়িটা আছে কিন্তু চাদর ও গামছা নাই। টেবিলের উপর খাতাপত্র ও বই এলোমেলো ছড়ানো থাকিত তাহার বদলে সেখানে একটা বড় বোতলের মধ্যে সোনালী মাছ ঝক্‌ঝক্‌ করিতে করিতে ওঠানামা করিতেছে। বোতলের গায়ের উপর মাষ্টার মশায়ের হস্তাক্ষরে বেণুর নামলেখা একটা কাগজ আঁটা। আর একটি নূতন ভাল বাঁধাই করা ইংরেজি ছবির বই; তাহার ভিতরকার পাতায় একপ্রান্তে বেণুর নাম ও তাহার নীচে আজকের তারিখ মাস ও সন দেওয়া আছে।

বেণু ছুটিয়া তাহার বাপের কাছে গিয়া কহিল, বাবা, মাষ্টার মশায় কোথায় গেছেন? বাপ তাহাকে কাছে টানিয়া লইয়া কহিলেন, তিনি কাজ ছাড়িয়া দিয়া চলিয়া গেছেন।

বেণু বাপের হাত ছাড়াইয়া লইয়া পাশের ঘরে বিছানার উপরে

উপুড় হইয়া পড়িয়া কাঁদিতে লাগিল। অধরবাবু ব্যাকুল হইয়া কি করিবেন কিছুই ভাবিয়া পাইলেন না।

পরদিন বেলা সাড়ে দশটার সময় হরলাল একটা মেসের ঘরে তক্তপোষের উপর উন্মনা হইয়া বসিয়া কলেজে যাইবে কিনা ভাবিতেছে এমন সময় হঠাৎ দেখিল প্রথমে অধরবাবুদের দরোয়ান ঘরে প্রবেশ করিল এবং তাহার পিছনে বেণু ঘরে ঢুকিয়াই হরলালের গলা জড়াইয়া ধরিল। হরলালের গলার স্বর আট্‌কাইয়া গেল ;—কথা কহিতে গেলেই তাহার দুই চোখ দিয়া জল ঝরিয়া পড়িবে এই ভয়ে সে কোনো কথাই কহিতে পারিল না। বেণু কহিল—মাষ্টার মশায়, আমাদের বাড়ি চল।

বেণু তাহাদের বৃদ্ধ দরোয়ান চন্দ্রভানকে ধরিয়া পড়িয়াছিল যেমন করিয়া হউক্ মাষ্টার মশায়ের বাড়িতে তাহাকে লইয়া যাইতে হইবে। পাড়ার যে মুটে হরলালের প্যাঁট্‌রা বহিয়া আনিয়াছিল তাহার কাছ হইতে সন্ধান লইয়া আজ স্কুলে যাইবার গাড়িতে চন্দ্রভান বেণুকে হরলালের মেসে আনিয়া উপস্থিত করিয়াছে।

কেন যে হরলালের পক্ষে বেণুদের বাড়ি যাওয়া একেবারেই অসম্ভব তাহা সে বলিতেও পারিল না অথচ তাহাদের বাড়িতেও যাইতে পারিল না। বেণু যে তাহার গলা জড়াইয়া ধরিয়া তাহাকে বলিয়াছিল আমাদের বাড়ি চল—এই স্পর্শ ও এই কথাটার স্মৃতি কত দিনে কত রাত্রে তাহার কণ্ঠ চাপিয়া ধরিয়া যেন তাহার নিশ্বাস রোধ করিয়াছে—কিন্তু ক্রমে এমনও দিন আসিল যখন দুই পক্ষেই সমস্ত চুকিয়া গেল—বক্ষের শিরা আঁকড়াইয়া ধরিয়া বেদনা-নিশাচর বাদুড়ের মত আর ঝুলিয়া রহিল না।

৬

হরলাল অনেক চেষ্টা করিয়াও পড়াতে আর তেমন করিয়া মনোযোগ করিতে পারিল না। সে কোনমতেই স্থির হইয়া পড়িতে বসিতে পারিত না। সে খানিকটা পড়িবার চেষ্টা করিয়াই ধাঁ করিয়া বই বন্ধ করিয়া ফেলিত এবং অকারণে দ্রুতপদে রাস্তায় ঘুরিয়া আসিত। কলেজে লেকচারের নোটের মাঝে মাঝে খুব বড় বড় ফাঁক পড়িত এবং মাঝে মাঝে যে সমস্ত আঁকযোক পড়িত তাহার সঙ্গে প্রাচীন ঈজিপ্টের চিত্রলিপি ছাড়া আর কোনো বর্ণমালার সাদৃশ্য ছিল না।

হরলাল বুঝিল এ সমস্ত ভাল লক্ষণ নয়। পরীক্ষায় সে যদি বা পাস হয় বৃত্তি পাইবার কোনো সম্ভাবনা নাই। বৃত্তি না পাইলে কলিকাতায় তাহার একদিনও চলিবে না। ওদিকে মাকেও দু'চার টাকা পাঠানো চাই। নানা চিন্তা করিয়া চাকরির চেষ্টায় বাহির হইল। চাকরি পাওয়া কঠিন, কিন্তু না পাওয়া তাহার পক্ষে আরও কঠিন; এই জন্য আশা ছাড়িয়াও আশা ছাড়িতে পারিল না।

হরলাল সৌভাগ্যক্রমে একটি বড় ইংরেজ সদাগরের আপিসে উমেদারী করিতে গিয়া হঠাৎ বড় সাহেবের নজরে পড়িল। সাহেবের বিশ্বাস ছিল তিনি মুখ দেখিয়া লোক চিনিতে পারেন। হরলালকে ডাকিয়া তাহার সঙ্গে দু'চার কথা কহিয়াই তিনি মনে মনে বলিলেন,—"এ লোকটা চলিবে।" জিজ্ঞাসা করিলেন, "কাজ জানা আছে?" হরলাল কহিল,—"না।" "কোনো বড়লোকের কাছ হইতে সার্টিফিকেট আনিতে পার?" কোনো বড়লোককেই সে জানে না।

শুনিয়া সাহেব আরও খুসি হইয়া কহিলেন,—"আচ্ছা বেশ,

পঁচিশ টাকা বেতনে কাজ আরম্ভ কর, কাজ শিখিলে উন্নতি হইবে।”—তার পরে সাহেব তাহার বেশভূষার প্রতি দৃষ্টি করিয়া কহিলেন,—“পনেরো টাকা আগাম দিতেছি—আফিসের উপযুক্ত কাপড় তৈয়ারি করাইয়া লইবে।”

কাপড় তৈরি হইলে, হরলাল আফিসেও বাহির হইতে আরম্ভ করিল। বড় সাহেব তাহাকে ভূতের মত খাটাইতে লাগিলেন। অন্য কেরাণীরা বাড়ি গেলেও হরলালের ছুটি ছিল না। এক একদিন সাহেবের বাড়ি গিয়াও তাঁহাকে কাজ বুঝাইয়া দিয়া আসিতে হইত।

এমনি করিয়া কাজ শিখিয়া লইতে হরলালের বিলম্ব হইল না। তাহার সহযোগী কেরাণীরা তাহাকে ঠকাইবার অনেক চেষ্টা করিল, তাহার বিরুদ্ধে উপরওয়ালাদের কাছে লাগালাগিও করিল, কিন্তু এই নিঃশব্দ নিরীহ সামান্য হরলালের কোনো অপকার করিতে পারিল না।

যখন তাহার চল্লিশ টাকা মাহিনা হইল, তখন হরলাল দেশ হইতে মাকে আনিয়া একটি ছোটখাট গলির মধ্যে ছোটখাট বাড়িতে বাসা করিল। এতদিন পরে তাহার মার দুঃখ ঘুচিল। মা বলিলেন,—“বাবা, এইবার বউ ঘরে আনিব।” হরলাল মাতার পায়ের ধূলা লইয়া বলিল, “মা ঐটে মাপ করিতে হইবে।”

মাতার আর একটি অনুরোধ ছিল। তিনি বলিতেন,—তুই যে দিনরাত তোর ছাত্র বেণুগোপালের গল্প করিস তাহাকে একবার নিমন্ত্রণ করিয়া খাওয়া। তাহাকে আমার দেখিতে ইচ্ছা করে।

হরলাল কহিল, মা, এ বাসায় তাহাকে কোথায় বসাইব? রোস, একটা বড় বাসা করি, তাহার পর তাহাকে নিমন্ত্রণ করিব।

৭

হরলালের বেতন বৃদ্ধির সঙ্গে ছোট গলি হইতে বড় গলি ও ছোট বাড়ি হইতে বড় বাড়িতে তাহার বাস পরিবর্ত্তন হইল। তবু সে কি জানি কি মনে করিয়া, অধরলালের বাড়ি যাইতে বা বেণুকে নিজের বাসায় ডাকিয়া আনিতে কোনোমতে মনস্থির করিতে পারিল না।

হয় ত কোনো দিনই তাহার সঙ্কোচ ঘুচিত না। এমন সময়ে হঠাৎ খবর পাওয়া গেল বেণুর মা মারা গিয়াছেন। শুনিয়া মুহূর্ত্ত বিলম্ব না করিয়া সে অধরলালের বাড়ি গিয়া উপস্থিত হইল।

এই দুই অসমবয়সী বন্ধুতে অনেক দিন পরে আবার একবার মিলন হইল। বেণুর অশৌচের সময় পার হইয়া গেল—তবু এ বাড়িতে হরলালের যাতায়াত চলিতে লাগিল। কিন্তু ঠিক তেমনটি আর কিছুই নাই। বেণু এখন বড় হইয়া উঠিয়া অঙ্গুষ্ঠ ও তর্জ্জনীযোগে তাহার নূতন গোঁফের রেখার সাধ্যসাধনা করিতেছে। চালচলনে বাবুয়ানা ফুটিয়া উঠিয়াছে। এখন তাহার উপযুক্ত বন্ধুবান্ধবেরও অভাব নাই। ফোনোগ্রাফে থিয়েটারের নটীদের ইতর গান বাজাইয়া সে বন্ধু মহলকে আমোদে রাখে। পড়িবার ঘরে সেই সাবেক ভাঙা চৌকি ও দাগী টেবিল কোথায় গেল। আয়নাতে, ছবিতে, আস্‌বাবে ঘর যেন ছাতি ফুলাইয়া রহিয়াছে। বেণু এখন কলেজে যায় কিন্তু দ্বিতীয় বার্ষিকের সীমানা পার হইবার জন্য তাহার কোন তাগিদ দেখা যায় না। বাপ স্থির করিয়া আছেন, দুই একটা পাস করাইয়া লইয়া বিবাহের হাটে ছেলের বাজার দর বাড়াইয়া তুলিবেন। কিন্তু ছেলের মা জানিতেন ও স্পষ্ট করিয়া বলিতেন, আমার বেণুকে সামান্য লোকের ছেলের

মত গৌরব প্রমাণ করিবার জন্য পাসের হিসাব দিতে হইবে না—লোহার সিন্ধুকে কোম্পানির কাগজ অক্ষয় হইয়া থাক্! ছেলেও মাতার এ কথাটা বেশ করিয়া মনে মনে বুঝিয়া লইয়াছিল।

যাহা হউক, বেণুর পক্ষে সে যে আজ নিতান্তই অনাবশ্যক তাহা হরলাল স্পষ্টই বুঝিতে পারিল এবং কেবলই থাকিয়া থাকিয়া সেই দিনের কথা মনে পড়িল, যেদিন বেণু হঠাৎ সকাল বেলায় তাহার মেসের বাসায় গিয়া তাহার গলা জড়াইয়া ধরিয়া বলিয়াছিল, মাষ্টার মশায় আমাদের বাড়ি চল। সে বেণু নাই, সে বাড়ি নাই, এখন মাষ্টার মশায়কে কেই বা ডাকিবে!

হরলাল মনে করিয়াছিল এইবার বেণুকে তাহাদের বাসায় মাঝে মাঝে নিমন্ত্রণ করিবে। কিন্তু তাহাকে আহ্বান করিবার জোর পাইল না। একবার ভাবিল, উহাকে আসিতে বলিব, তাহার পরে ভাবিল, লাভ কি—বেণু হয় ত নিমন্ত্রণ রক্ষা করিবে কিন্তু থাক্।

হরলালের মা ছাড়িলেন না। তিনি বার বার বলিতে লাগিলেন, তিনি নিজের হাতে বাঁধিয়া তাহাকে খাওয়াইবেন—আহা বাছার মা মারা গেছে!

অবশেষে হরলাল একদিন তাহাকে নিমন্ত্রণ করিতে গেল। কহিল, অধর বাবুর কাছ হইতে অনুমতি লইয়া আসি। বেণু কহিল, "অনুমতি লইতে হইবে না, আপনি কি মনে করেন আমি এখনও সেই খোকাবাবু আছি?"

হরলালের বাসায় বেণু খাইতে আসিল। মা এই কার্ত্তিকের মত ছেলেটিকে তাঁহার দুই স্নিগ্ধচক্ষুর আশীর্ব্বাদে অভিষিক্ত করিয়া যত্ন করিয়া খাওয়াইলেন। তাঁহার কেবলি মনে হইতে লাগিল

আহা এই বয়সের এমন ছেলেকে ফেলিয়া ইহার মা যখন মরিল তখন তাহার প্রাণ না জানি কেমন করিতেছিল!

আহার সারিয়াই বেণু কহিল—মাষ্টার মশায়, আমাকে আজ একটু সকাল সকাল যাইতে হইবে। আমার দুই একজন বন্ধুর আসিবার কথা আছে।

বলিয়া পকেট হইতে সোনার ঘড়ি খুলিয়া একবার সময় দেখিয়া লইল; তাহার পরে সংক্ষেপে বিদায় লইয়া জুড়ি গাড়িতে চড়িয়া বসিল। হরলাল তাহার বাসার দরজার কাছে দাঁড়াইয়া রহিল। গাড়ি সমস্ত গলিকে কাঁপাইয়া দিয়া মুহূর্ত্তের মধ্যেই চোখের বাহির হইয়া গেল।

মা কহিলেন, হরলাল উহাকে মাঝে মাঝে ডাকিয়া আনিস্। এই বয়সে উহার মা মারা গেছে মনে করিলে আমার প্রাণটা কেমন করিয়া উঠে।

হরলাল চুপ করিয়া রহিল। এই মাতৃহীন ছেলেটিকে সান্ত্বনা দিবার জন্য সে কোনো প্রয়োজন বোধ করিল না। দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া মনে মনে কহিল—"বাস্, এই পর্য্যন্ত! আর কখনো ডাকিব না! একদিন পাঁচ টাকা মাইনের মাষ্টারি করিয়াছিলাম বটে—কিন্তু আমি সামান্য হরলাল মাত্র।"

৮

একদিন সন্ধ্যার পর হরলাল আপিস হইতে ফিরিয়া আসিয়া দেখিল তাহার একতালার ঘরে অন্ধকারে কে একজন বসিয়া আছে। সেখানে যে কোনো লোক আছে তাহা লক্ষ্য না করিয়াই সে বোধ হয় উপরে উঠিয়া যাইত কিন্তু দরজায় ঢুকিয়াই দেখিল

এসেন্সের গন্ধে আকাশ পূর্ণ। ঘরে প্রবেশ করিয়া হরলাল জিজ্ঞাসা করিল, "কে মশায়?" বেণু বলিয়া উঠিল—"মাষ্টার মশায়, আমি।"

হরলাল কহিল—এ কি ব্যাপার? কখন আসিয়াছ?

বেণু কহিল—অনেকক্ষণ আসিয়াছি। আপনি যে এত দেরি করিয়া আপিস হইতে ফেরেন তাহা ত আমি জানিতাম না।

বহুকাল হইল সেই যে নিমন্ত্রণ খাইয়া গেছে তাহার পরে আর একবারও বেণু এ বাসায় আসে নাই। বলা নাই কহা নাই আজ হঠাৎ এমন করিয়া সে যে সন্ধ্যার সময় এই অন্ধকার ঘরের মধ্যে অপেক্ষা করিয়া বসিয়া আছে ইহাতে হরলালের মন উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিল।

উপরের ঘরে গিয়া বাতি জ্বালিয়া দুই জনে বসিল। হরলাল জিজ্ঞাসা করিল—সব ভাল ত? কিছু বিশেষ খবর আছে?

বেণু কহিল, পড়াশুনা ক্রমে তাহার পক্ষে বড়ই একঘেয়ে হইয়া আসিয়াছে। কাঁহাতক সে বৎসরের পর বৎসর ঐ সেকেণ্ড ইয়ারেই আটকা পড়িয়া থাকে। তাহার চেয়ে অনেক বয়সে ছোট ছেলের সঙ্গে তাহাকে এক সঙ্গে পড়িতে হয়—তাহার বড় লজ্জা করে কিন্তু বাবা কিছুতেই বোঝেন না।

হরলাল জিজ্ঞাসা করিল—তোমার কি ইচ্ছা?

বেণু কহিল, তাহার ইচ্ছা সে বিলাত যায়, বারিষ্টার হইয়া আসে। তাহারই সঙ্গে এক সঙ্গে পড়িত, এমন কি, তাহার চেয়ে পড়াশুনায় অনেক কাঁচা একটি ছেলে বিলাতে যাইবে স্থির হইয়া গেছে।

হরলাল কহিল,—তোমার বাবাকে তোমার ইচ্ছা জানাইয়াছ?

বেণু কহিল—জানাইয়াছি। বাবা বলেন পাস না করিলে বিলাতে যাইবার প্রস্তাব তিনি কানে আনিবেন না। কিন্তু আমার মন খারাপ হইয়া গেছে—এখানে থাকিলে আমি কিছুতেই পাস করিতে পারিব না।

হরলাল চুপ করিয়া বসিয়া ভাবিতে লাগিল। বেণু কহিল—আজ এই কথা লইয়া বাবা আমাকে যাহা মুখে আসিয়াছে তাহাই বলিয়াছেন। তাই আমি বাড়ি ছাড়িয়া চলিয়া আসিয়াছি। মা থাকিলে এমন কখনোই হইতে পারিত না।—বলিতে বলিতে সে অভিমানে কাঁদিতে লাগিল।

হরলাল কহিল—চল আমিসুদ্ধ তোমার বাবার কাছে যাই, পরামর্শ করিয়া যাহা ভাল হয় স্থির করা যাইবে।

বেণু কহিল—না, আমি সেখানে যাইব না।

বাপের সঙ্গে রাগারাগি করিয়া হরলালের বাড়িতে আসিয়া বেণু থাকিবে এ কথাটা হরলালের মোটেই ভাল লাগিল না। অথচ আমার বাড়ি থাকিতে পারিবে না এ কথা বলাও বড় শক্ত। হরলাল ভাবিল আর একটু বাদে মনটা একটু ঠাণ্ডা হইলেই ইহাকে ভুলাইয়া বাড়ি লইয়া যাইব। জিজ্ঞাসা করিল—তুমি খাইয়া আসিয়াছ?

বেণু কহিল—না, আমার ক্ষুধা নাই—আমি আজ খাইব না।

হরলাল কহিল—"সে কি হয়?" তাড়াতাড়ি মাকে গিয়া কহিল,—"মা বেণু আসিয়াছে, তাহার জন্য কিছু খাবার চাই।"

শুনিয়া মা ভারি খুসি হইয়া খাবার তৈরি করিতে গেলেন। হরলাল আপিসের কাপড় ছাড়িয়া মুখ হাত ধুইয়া বেণুর কাছে

আসিয়া বসিলেন। একটুখানি কাশিয়া একটুখানি ইতস্তত করিয়া তিনি বেণুর কাঁধের উপর হাত রাখিয়া কহিলেন—বেণু, কাজটা ভাল হইতেছে না। বাবার সঙ্গে ঝগড়া করিয়া বাড়ি হইতে চলিয়া আসা, এটা তোমার উপযুক্ত নয়।

শুনিয়া তখনি বিছানা ছাড়িয়া উঠিয়া বেণু কহিল, "আপনার এখানে যদি সুবিধা না হয় আমি সতীশের বাড়ি যাইব।"—বলিয়া সে চলিয়া যাইবার উপক্রম করিল। হরলাল তাহার হাত ধরিয়া কহিল—রোস, কিছু খাইয়া যাও।

বেণু রাগ করিয়া কহিল—"না, আমি খাইতে পারিব না।" বলিয়া হাত ছাড়াইয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া আসিল।

এমন সময়, হরলালের জন্য যে জলখাবার প্রস্তুত ছিল তাহাই বেণুর জন্য থালায় গুছাইয়া মা তাহাদের সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। কহিলেন, কোথায় যাও বাছা!

বেণু কহিল,—আমার কাজ আছে আমি চলিলাম।

মা কহিলেন,—সে কি হয় বাছা, কিছু না খাইয়া যাইতে পারিবে না। এই বলিয়া সেই বারান্দায় পাত পাড়িয়া তাহাকে হাত ধরিয়া খাওয়াইতে বসাইলেন।

বেণু রাগ করিয়া কিছুই খাইতেছে না—খাবার লইয়া একটু নাড়চাড়া করিতেছে মাত্র এমন সময় দরজার কাছে একটা গাড়ি আসিয়া থামিল। প্রথমে একটা দরোয়ান ও তাহার পশ্চাতে স্বয়ং অধরবাবু মচ্‌মচ্‌ শব্দে সিঁড়ি বাহিয়া উপরে আসিয়া উপস্থিত। বেণুর মুখ বিবর্ণ হইয়া গেল।

মা ঘরের মধ্যে সরিয়া গেলেন। অধর ছেলের সম্মুখে আসিয়া ক্রোধে কম্পিতকণ্ঠে হরলালের দিকে চাহিয়া কহিলেন—

এই বুঝি! রতিকান্ত আমাকে তখনি বলিয়াছিল কিন্তু, তোমার পেটে যে এত মৎলব ছিল তাহা আমি বিশ্বাস করি নাই। তুমি মনে করিয়াছ বেণুকে বশ করিয়া উহার ঘাড় ভাঙিয়া খাইবে! কিন্তু সে হইতে দিব না। ছেলে চুরি করিবে! তোমার নামে পুলিস্ কেস্ করিব তোমাকে জেলে ঠেলিব তবে ছাড়িব।—এই বলিয়া বেণুর দিকে চহিয়া কহিলেন—"চল্! ওঠ!" বেণু কোনো কথাটি না কহিয়া তাহার বাপের পিছনে পিছনে চলিয়া গেল।

সেদিন কেবল হরলালের মুখেই খাবার উঠিল না।

৯

এবারে হরলালের সদাগর আপিস কি জানি কি কারণে মফস্বল হইতে প্রচুর পরিমাণে চাল ডাল খরিদ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছে। এই উপলক্ষ্যে হরলালকে প্রতি সপ্তাহেই শনিবার ভোরের গাড়িতে সাত আট হাজার টাকা লইয়া মফস্বলে যাইতে হইত। পাইকেড়দিগকে হাতে হাতে দাম চুকাইয়া দিবার জন্য মফস্বলের একটা বিশেষ কেন্দ্রে তাহার যে আপিস আছে সেইখানে দশ ও পাঁচ টাকার নোট ও নগদ টাকা লইয়া সে যাইত, সেখানে রসিদ ও খাতা দেখিয়া গত সপ্তাহের মোটা হিসাব মিলাইয়া, বর্ত্তমান সপ্তাহের কাজ চালাইবার জন্য টাকা রাখিয়া আসিত। সঙ্গে আপিসের দুই জন দরোয়ান যাইত। হরলালের জামিন নাই বলিয়া আপিসে একটা কথা উঠিয়াছিল, কিন্তু বড় সাহেব নিজের উপর সমস্ত ঝুঁকি লইয়া বলিয়াছিলেন হরলালের জামিনের প্রয়োজন নাই।

মাঘমাস হইতে এইভাবে কাজ চলিতেছে—চৈত্র পর্য্যন্ত চলিবে

এমন সম্ভাবনা আছে। এই ব্যাপাব লইয়া হরলাল বিশেষ ব্যস্ত ছিল। প্রায়ই তাহাকে অনেক রাত্রে আপিস হইতে ফিরিতে হইত।

একদিন এইরূপ রাত্রে ফিরিয়া শুনিল বেণু আসিয়াছিল, মা তাহাকে খাওয়াইয়া যত্ন করিয়া বসাইয়াছিলেন—সেদিন তাহার সঙ্গে কথাবার্ত্তা গল্প করিয়া তাহার প্রতি তাঁহার মন আরো স্নেহে আকৃষ্ট হইয়াছে।

এমন আরো দুই একদিন হইতে লাগিল। মা বলিলেন,—"বাড়িতে মা নাই নাকি, সেই জন্য সেখানে তাহার মন টেকে না। আমি বেণুকে তোর ছোট ভাইয়ের মত, আপন ছেলের মতই দেখি। সেই স্নেহ পাইয়া আমাকে কেবল মা বলিয়া ডাকিবার জন্য এখানে আসে।"—এই বলিয়া আঁচলের প্রান্ত দিয়া তিনি চোখ মুছিলেন।

হরলালের একদিন বেণুর সঙ্গে দেখা হইল। সেদিন সে অপেক্ষা করিয়া বসিয়া ছিল। অনেক রাত পর্য্যন্ত কথাবার্ত্তা হইল। বেণু বলিল, "বাবা আজকাল এমন হইয়া উঠিয়াছেন যে আমি কিছুতেই বাড়িতে টিঁকিতে পারিতেছি না। বিশেষত শুনিতে পাইতেছি তিনি বিবাহ করিবার জন্য প্রস্তুত হইতেছেন। রতিবাবু সম্বন্ধ লইয়া আসিতেছেন—তাঁহার সঙ্গে কেবলি পরামর্শ চলিতেছে। পূর্ব্বে আমি কোথাও গিয়া দেরি করিলে বাবা অস্থির হইয়া উঠিতেন, এখন যদি আমি দুই চার দিন বাড়িতে না ফিরি তাহা হইলে তিনি আরাম বোধ করেন। আমি বাড়ি থাকিলে বিবাহের আলোচনা সাবধানে করিতে হয় বলিয়া আমি না থাকিলে তিনি হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচেন। এ বিবাহ যদি হয় তবে

আমি বাড়িতে থাকিতে পারিব না। আমাকে আপনি উদ্ধারের একটা পথ দেখাইয়া দিন—আমি স্বতন্ত্র হইতে চাই।”

স্নেহে ও বেদনায় হরলালের হৃদয় পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। সঙ্কটের সময় আর সকলকে ফেলিয়া বেণু যে তাহার সেই মাষ্টার মশায়ের কাছে আসিয়াছে ইহাতে কষ্টের সঙ্গে সঙ্গে তাহার আনন্দ হইল। কিন্তু মাষ্টার মশায়ের কতটুকুই বা সাধ্য আছে!

বেণু কহিল—যেমন করিয়া হৌক বিলাতে গিয়া বারিষ্টার হইয়া আসিলে এই বিপদ হইতে পরিত্রাণ পাই!

হরলাল কহিল—অধরবাবু কি যাইতে দিবেন?

বেণু কহিল—আমি চলিয়া গেলে তিনি বাঁচেন; কিন্তু টাকার উপরে যে রকম মায়া বিলাতের খরচ তাঁহার কাছ হইতে সহজে আদায় হইবে না। একটু কৌশল করিতে হইবে।

হরলাল বেণুর বিজ্ঞতা দেখিয়া হাসিয়া কহিল—কি কৌশল?

বেণু কহিল—আমি হ্যাণ্ডনোটে টাকা ধার করিব। পাওনাদার আমার নামে নালিশ করিলে বাবা তখন দায়ে পড়িয়া শোধ করিবেন। সেই টাকায় পালাইয়া বিলাত যাইব। সেখানে গেলে তিনি খরচ না দিয়া থাকিতে পারিবেন না।

হরলাল কহিল—তোমাকে টাকা ধার দিবে কে?

বেণু কহিল—আপনি পারেন না?

হরলাল আশ্চর্য্য হইয়া কহিল—আমি!—তাহার মুখে আর কোন কথা বাহির হইল না।

বেণু কহিল—কেন আপনার দরোয়ান ত তোড়ায় করিয়া অনেক টাকা ঘরে আনিল।

হরলাল হাসিয়া কহিল—সে দরোয়ানও যেমন আমার টাকাও তেমনি।

বলিয়া এই আপিসের টাকার ব্যবহারটা কি তাহা বেণুকে বুঝাইয়া দিল। এই টাকা কেবল একটি রাত্রের জন্য দরিদ্রের ঘরে আশ্রয় লয়, প্রভাত হইলে দশ দিকেতে গমন।

বেণু কহিল—আপনাদের সাহেব আমাকে ধার দিতে পারেন না? না হয় আমি সুদ বেশি করিয়া দিব।

হরলাল কহিল—তোমার বাপ যদি সিকিউরিটি দেন তাহা হইলে আমার অনুরোধে হয় ত দিতেও পারেন।

বেণু কহিল—বাবা যদি সিকিউরিটি দিবেন ত টাকা দিবেন না কেন?

তর্কটা এইখানেই মিটিয়া গেল। হরলাল মনে মনে ভাবিতে লাগিল, আমার যদি কিছু থাকিত তবে বাড়িঘর জমিজমা সমস্ত বেচিয়া কিনিয়া টাকা দিতাম। কিন্তু একটি মাত্র অসুবিধা এই যে বাড়িঘর জমিজমা কিছুই নাই।

১০

একদিন শুক্রবার রাত্রে হরলালের বাসার সম্মুখে জুড়িগাড়ি দাঁড়াইল। বেণু গাড়ি হইতে নামিবামাত্র হরলালের আপিসের দরোয়ান তাহাকে মস্ত একটা সেলাম করিয়া উপরে বাবুকে শশব্যস্ত হইয়া সংবাদ দিতে গেল। হরলাল তখন তাহার শোবার ঘরে মেজের উপর বসিয়া টাকা মিলাইয়া লইতেছিল। বেণু সেই ঘরেই প্রবেশ করিল। আজ তাহার বেশ কিছু নূতন ধরনের। সৌখীন ধুতি চাদরের বদলে নধর শরীরে পার্সি কোট ও প্যান্টলুন

আঁটিয়া মাথায় ক্যাপ পরিয়া আসিয়াছে। তাহার দুই হাতের আঙুলে মণিমুক্তার আংটি ঝকমক্ করিতেছে। গলা হইতে লম্বিত মোটা সোনার চেনে আবদ্ধ ঘড়ি বুকের পকেটে নিবিষ্ট। কোটের আস্তিনের ভিতর হইতে জামার হাতায় হীরার বোতাম দেখা যাইতেছে।

হরলাল টাকা গোণা বন্ধ করিয়া আশ্চর্য্য হইয়া কহিল,—একি ব্যাপার? এত রাত্রে এ বেশে যে?

বেণু কহিল—পশু বাবার বিবাহ। তিনি আমার কাছে তাহা গোপন করিয়া রাখিয়াছেন কিন্তু আমি খবর পাইয়াছি। বাবাকে বলিলাম আমি কিছুদিনের জন্য আমাদের বারাকপুরের বাগানে যাইব। শুনিয়া তিনি ভারি খুসি হইয়া রাজি হইয়াছেন। তাই বাগানে চলিয়াছি; ইচ্ছা হইতেছে আর ফিরিব না। যদি সাহস থাকিত তবে গঙ্গার জলে ডুবিয়া মরিতাম।

বলিতে বলিতে বেণু কাঁদিয়া ফেলিল। হরলালের বুকে যেন ছুরি বিঁধিতে লাগিল। একজন অপরিচিত স্ত্রীলোক আসিয়া মার ঘর, মার খাট, মার স্থান অধিকার করিয়া লইলে বেণুর স্নেহস্মৃতিজড়িত বাড়ি যে বেণুর পক্ষে কি রকম কণ্টকময় হইয়া উঠিবে তাহা হরলাল সমস্ত হৃদয় দিয়া বুঝিতে পারিল। মনে মনে ভাবিল পৃথিবীতে গরীব হইয়া না জন্মিলেও দুঃখের এবং অপমানের অন্ত নাই। বেণুকে কি বলিয়া যে সে সান্ত্বনা দিবে তাহা কিছুই ভাবিয়া না পাইয়া বেণুর হাতখানা নিজের হাতে লইল। লইবামাত্র একটা তর্ক তাহার মনে উদয় হইল। সে ভাবিল এমন একটা বেদনার সময় বেণু কি করিয়া এত সাজ করিতে পারিল।

হরলাল তাহার আংটির দিকে চোখ রাখিয়াছে দেখিয়া বেণু যেন তাহার মনের প্রশ্নটা আঁচিয়া লইল। সে বলিল—এই আংটি গুলি আমার মায়ের।

শুনিয়া হরলাল বহুকষ্টে চোখের জল সাম্‌লাইয়া লইল। কিছুক্ষণ পরে কহিল,—বেণু, খাইয়া আসিয়াছ?

বেণু কহিল,—হাঁ,—আপনার খাওয়া হয় নাই?

হরলাল কহিল, টাকাগুলি গণিয়া আয়রন চেষ্টে না তুলিয়া ঘর হইতে বাহির হইতে পারিব না।

বেণু কহিল,—আপনি খাইয়া আসুন, আপনার সঙ্গে অনেক কথা আছে। আমি ঘরে রহিলাম, মা আপনার খাবার লইয়া বসিয়া আছেন।

হরলাল একটু ইতস্তত করিয়া কহিল, আমি চট করিয়া খাইয়া আসিতেছি।

হরলাল তাড়াতাড়ি খাওয়া সারিয়া মাকে লইয়া ঘরে প্রবেশ করিল। বেণু তাঁহাকে প্রণাম করিল, তিনি বেণুর চিবুকের স্পর্শ লইয়া চুম্বন করিলেন। হরলালের কাছে সমস্ত খবর পাইয়া তাঁহার বুক যেন ফাটিয়া যাইতেছিল। নিজের সমস্ত স্নেহ দিয়াও বেণুর অভাব তিনি পূরণ করিতে পারিবেন না এই তাঁহার দুঃখ।

চারিদিকে ছড়ানো টাকার মধ্যে তিনজনে বসিয়া বেণুর ছেলেবেলাকার গল্প হইতে লাগিল। মাষ্টার মশায়ের জীবনের সঙ্গে জড়িত তাহার কত দিনের কত ঘটনা। তাহার মাঝে মাঝে সেই অসংযত স্নেহশালিনী মার কথাও আসিয়া পড়িতে লাগিল।

এমনি করিয়া রাত অনেক হইয়া গেল। হঠাৎ এক সময় ঘড়ি খুলিয়া বেণু কহিল,—আর নয় দেরি করিলে গাড়ি ফেল করিব।

হরলালের মা কহিলেন—বাবা আজ রাত্রে এইখানেই থাক না, কাল সকালে হরলালের সঙ্গে এক সঙ্গেই বাহির হইবে।

বেণু মিনতি করিয়া কহিল—না মা, এ অনুরোধ করিবেন না, আজ রাত্রে যে করিয়া হউক আমাকে যাইতেই হইবে।

হরলালকে কহিল—মাষ্টার মশায়, এই আংটি ঘড়িগুলা বাগানে লইয়া যাওয়া নিরাপদ নয়। আপনার কাছেই রাখিয়া যাই, ফিরিয়া আসিয়া লইয়া যাইব। আপনার দরোয়ানকে বলিয়া দিন আমার গাড়ি হইতে চামড়ার হ্যাণ্ডব্যাগটা আনিয়া দিক্। সেইটের মধ্যে এগুলা রাখিয়া দিই।

আফিসের দরোয়ান গাড়ি হইতে ব্যাগ্ লইয়া আসিল। বেণু তাহার চেন্ ঘড়ি আংটি বোতাম সমস্ত খুলিয়া ব্যাগের মধ্যে পুরিয়া দিল। সতর্ক হরলাল সেই ব্যাগটি লইয়া তখনি আয়রন সেফের মধ্যে রাখিল।

বেণু হরলালের মার পায়ের ধূলা লইল। তিনি রুদ্ধ কণ্ঠে আশীর্ব্বাদ করিলেন,—মা জগদম্বা তোমার মা হইয়া তোমাকে রক্ষা করুন।

তাহার পরে বেণু হরলালের পাদস্পর্শ করিয়া প্রণাম করিল। আর কোনদিন সে হরলালকে এমন করিয়া প্রণাম করে নাই। হরলাল কোনো কথা না বলিয়া তাহার পিঠে হাত দিয়া তাহার সঙ্গে সঙ্গে নীচে নামিয়া আসিল। গাড়ির লণ্ঠনে আলো জ্বলিল, ঘোড়া দুটা অধীর হইয়া উঠিল। কলিকাতার গ্যাসালোকখচিত নিশীথের মধ্যে বেণুকে লইয়া গাড়ি অদৃশ্য হইয়া গেল।

হরলাল তাহার ঘরে আসিয়া অনেকক্ষণ ধরিয়া চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। তাহার পর একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া টাকা

গণিতে গণিতে ভাগ করিয়া এক একটা থলিতে ভর্ত্তি করিতে লাগিল। নোটগুলা পূর্ব্বেই গণা হইয়া থলিবন্দি হইয়া লোহার সিন্দুকে উঠিয়াছিল।

১১

লোহার সিন্ধুকের চাবি মাথার বালিশের নীচে রাখিয়া সেই টাকার ঘরেই হরলাল অনেক রাত্রে শয়ন করিল। ভাল ঘুম হইল না। স্বপ্ন দেখিল—বেণুর মা পর্দ্দার আড়াল হইতে তাহাকে উচ্চস্বরে তিরস্কার করিতেছেন; কথা কিছুই স্পষ্ট শুনা যাইতেছে না, কেবল সেই অনির্দ্দিষ্ট কণ্ঠস্বরের সঙ্গে সঙ্গে বেণুর মার চুনী পান্না হীরার অলঙ্কার হইতে লাল সবুজ শুভ্র রশ্মির সূচিগুলি কালো পর্দ্দাটাকে ফুঁড়িয়া বাহির হইয়া আন্দোলিত হইতেছে। হরলাল প্রাণপণে বেণুকে ডাকিবার চেষ্টা করিতেছে কিন্তু তাহার গলা দিয়া কিছুতেই স্বর বাহির হইতেছে না। এমন সময় প্রচণ্ড শব্দে কি একটা ভাঙিয়া পর্দ্দা ছিঁড়িয়া পড়িয়া গেল,—চমকিয়া চোখ মেলিয়া হরলাল দেখিল একটা স্তূপাকার অন্ধকার। হঠাৎ একটা দমকা হাওয়া উঠিয়া সশব্দে জান্‌লায় ঠেলা দিয়া আলো নিবাইয়া দিয়াছে। হরলালের সমস্ত শরীর ঘামে ভিজিয়া গেছে। সে তাড়াতাড়ি উঠিয়া দেশালাই দিয়া আলো জ্বালিল। ঘড়িতে দেখিল চারটে বাজিয়াছে; আর ঘুমাইবার সময় নাই—টাকা লইয়া মফস্বলে যাইবার জন্য প্রস্তুত হইতে হইবে।

হরলাল মুখ ধুইয়া ফিরিবার সময় মা তাহার ঘর হইতে কহিলেন,—কি বাবা উঠিয়াছিস্?

হরলাল প্রভাতে প্রথমে মাতার মঙ্গল মুখ দেখিবার জন্য ঘরে

প্রবেশ করিল। মা তাহার প্রণাম লইয়া মনে মনে তাহাকে আশীর্ব্বাদ করিয়া কহিলেন—বাবা, আমি এইমাত্র স্বপ্ন দেখিতেছিলাম তুই যেন বউ আনিতে চলিয়াছিস্। ভোরের স্বপন কি মিথ্যা হইবে?

হরলাল হাসিয়া ঘরে প্রবেশ করিল। টাকা ও নোটের থলেগুলো লোহার সিন্ধুক হইতে বাহির করিয়া প্যাকবাক্সয় বন্ধ করিবার জন্য উদ্যোগ করিতে লাগিল। হঠাৎ তাহার বুকের ভিতর ধড়াস্ করিয়া উঠিল—দুই তিনটা নোটের থলি শূন্য। মনে হইল স্বপন দেখিতেছি। থলেগুলা লইয়া সিন্ধুকের গায়ে জোরে আছাড় দিল—তাহাতে শূন্য থলের শূন্যতা অপ্রমাণ হইল না। তবু বৃথা আশায় থলের বন্ধনগুলা খুলিয়া খুব করিয়া ঝাড়া দিল, একটি থলের ভিতর হইতে দুইখানি চিঠি বাহির হইয়া পড়িল। বেণুর হাতের লেখা—একটি চিঠি তাহার বাপের নামে, আর একটি হরলালের।

তাড়াতাড়ি খুলিয়া পড়িতে গেল। চোখে যেন দেখিতে পাইল না। মনে হইল যেন আলো যথেষ্ট নাই। কেবলি বাতি উস্কাইয়া দিতে লাগিল। যাহা পড়ে তাহা ভাল বোঝে না, বাংলা ভাষা যেন ভুলিয়া গেছে।

কথাটা এই যে, বেণু তিন হাজার টাকার পরিমাণ দশটাকা-ওয়ালা নোট লইয়া বিলাতে যাত্রা করিয়াছে, আজ ভোরেই জাহাজ ছাড়িবার কথা। হরলাল যে সময় খাইতে গিয়াছিল, সেই সময় বেণু এই কাণ্ড করিয়াছে। লিখিয়াছে যে,—"বাবাকে চিঠি দিলাম, তিনি আমার এই ঋণ শোধ করিয়া দিবেন! তা ছাড়া ব্যাগ খুলিয়া দেখিবেন তাহার মধ্যে মায়ের যে গহনা আছে

তাহার দাম কত ঠিক জানি না, বোধ হয় তিন হাজার টাকার বেশি হইবে। মা যদি বাঁচিয়া থাকিতেন তবে বাবা আমাকে বিলাতে যাইবার টাকা না দিলেও এই গহনা দিয়াই নিশ্চয় মা আমার খরচ জোগাড় করিয়া দিতেন। আমার মায়ের গহনা বাবা যে আর কাহাকেও দিবেন তাহা আমি সহ্য করিতে পারি নাই। সেইজন্য যেমন করিয়া পারি আমিই তাহা লইয়াছি। বাবা যদি টাকা দিতে দেরি করেন তবে আপনি অনায়াসে এই গহনা বেচিয়া বা বন্ধক দিয়া টাকা লইতে পারিবেন। এ আমার মায়ের জিনিষ—এ আমারই জিনিষ।" এ ছাড়া আরো অনেক কথা—সে কোনো কাজের কথা নহে।

হরলাল ঘরে তালা দিয়া তাড়াতাড়ি একখানা গাড়ি লইয়া গঙ্গার ঘাটে ছুটিল। কোন্ জাহাজে বেণু যাত্রা করিয়াছে তাহার নামও সে জানে না। মেটিয়াবুরুজ পর্য্যন্ত ছুটিয়া হরলাল খবর পাইল দুই খানা জাহাজ ভোরে রওনা হইয়া গেছে। দু'খানাই ইংলণ্ডে যাইবে, কোন জাহাজে বেণু আছে তাহাও তাহার অনুমানের অতীত এবং সে জাহাজ ধরিবার যে কি উপায় তাহাও সে ভাবিয়া পাইল না।

মেটিয়াবুরুজ হইতে তাহার বাসার দিকে যখন গাড়ি ফিরিল তখন সকালের রৌদ্রে কলিকাতার সহর জাগিয়া উঠিয়াছে। হরলালের চোখে কিছুই পড়িল না। তাহার সমস্ত হতবুদ্ধি অন্তঃকরণ একটা কলেবরহীন নিদারুণ প্রতিকূলতাকে যেন কেবলি প্রাণপণে ঠেলা মারিতেছিল—কিন্তু কোথাও এক তিলও তাহাকে টলাইতে পারিতেছিল না। যে বাসায় তাহার মা থাকেন, এতদিন যে বাসায় পা দিবামাত্র কর্ম্মক্ষেত্রের সমস্ত ক্লান্তি ও

সংঘাতের বেদনা মুহূর্ত্তের মধ্যেই তাহার দূর হইয়াছে—সেই বাসার সম্মুখে গাড়ি আসিয়া দাঁড়াইল—গাড়োয়ানের ভাড়া চুকাইয়া দিয়া সেই বাসার মধ্যে সে অপরিমেয় নৈরাশ্য ও ভয় লইয়া প্রবেশ করিল।

মা উদ্বিগ্ন হইয়া বারান্দায় দাঁড়াইয়াছিলেন। জিজ্ঞাসা করিলেন,—বাবা কোথায় গিয়াছিলে?

হরলাল বলিয়া উঠিল—মা, তোমার জন্য বউ আনিতে গিয়াছিলাম।—বলিয়া শুষ্ককণ্ঠে হাসিতে হাসিতে সেইখানেই মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়া গেল।

"ওমা, কি হইল গো" বলিয়া মা তাড়াতাড়ি জল আনিয়া তাহার মুখে জলের ঝাপটা দিতে লাগিলেন।

কিছুক্ষণ পরে হরলাল চোখ খুলিয়া শূন্যদৃষ্টিতে চারিদিকে চাহিয়া উঠিয়া বসিল। হরলাল কহিল—মা, তোমরা ব্যস্ত হইও না। আমাকে একটু একলা থাকিতে দাও। বলিয়া সে তাড়াতাড়ি ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিয়াই ভিতর হইতে দরজা বন্ধ করিয়া দিল। মা দরজার বাহিরে মাটির উপর বসিয়া পড়িলেন,—ফাল্গুনের রৌদ্র তাঁহার সর্ব্বাঙ্গে আসিয়া পড়িল। তিনি রুদ্ধ দরজার উপর মাথা রাখিয়া থাকিয়া থাকিয়া কেবল ডাকিতে লাগিলেন,—হরলাল, বাবা হরলাল।

হরলাল কহিল,—মা, একটু পরেই আমি বাহির হইব, এখন তুমি যাও!

মা রৌদ্রে সেইখানেই বসিয়া জপ করিতে লাগিলেন।

আপিসের দরোয়ান আসিয়া দরজায় ঘা দিয়া কহিল—বাবু, এখনি না বাহির হইলে আর গাড়ি পাওয়া যাইবে না।

হরলাল ভিতর হইতে কহিল—আজ সাতটার গাড়িতে যাওয়া হইবে না।

দরোয়ান কহিল—তবে কখন যাইবেন ?

হরলাল কহিল—সে আমি তোমাকে পরে বলিব।

দরোয়ান মাথা নাড়িয়া হাত উল্টাইয়া নীচে চলিয়া গেল।

হরলাল ভাবিতে লাগিল—এ কথা বলি কাহাকে ? এ যে চুরি ! বেণুকে কি জেলে দিব ?

হঠাৎ সেই গহনার কথা মনে পড়িল। সে কথাটা একেবারে ভুলিয়া গিয়াছিল। মনে হইল যেন কিনারা পাওয়া গেল। ব্যাগ খুলিয়া দেখে তাহার মধ্যে শুধু আংটি, ঘড়ি, বোতাম, হার নহে—ব্রেস্‌লেট, চিক, সিঁথি, মুক্তারমালা প্রভৃতি আরো অনেক দামী গহনা আছে। তাহার দাম তিন হাজার টাকার অনেক বেশি। কিন্তু এও ত চুরি ! এও ত বেণুর নয়। এ ব্যাগ যতক্ষণ তাহার ঘরে থাকে ততক্ষণ তাহার বিপদ।

তখন আর দেরি না করিয়া অধরলালের সেই চিঠি ও ব্যাগ লইয়া হরলাল ঘর হইতে বাহির হইল।

মা জিজ্ঞাসা করিলেন—কোথায় যাও বাবা।

হরলাল কহিল—অধরবাবুর বাড়িতে।

মার বুক হইতে হঠাৎ অনির্দ্দিষ্ট ভয়ের একটা মস্ত বোঝা নামিয়া গেল। তিনি স্থির করিলেন ঐ যে হরলাল কাল শুনিয়াছে বেণুর বাপের বিয়ে তাই শুনিয়া অবধি বাছার মনে শান্তি নাই। আহা, বেণুকে কত ভালই বাসে !

মা জিজ্ঞাসা করিলেন—আজ তবে তোমার আর মফস্বলে যাওয়া হইবে না ?

হরলাল কহিল—না। বলিয়াই তাড়াতাড়ি বাহির হইয়া পড়িল।

অধরবাবুর বাড়ি পৌঁছিবার পূর্ব্বেই দূর হইতে শোনা গেল রসনচৌকি আলেয়া রাগিণীতে করুণস্বরে আলাপ জুড়িয়া দিয়াছে, কিন্তু হরলাল দরজায় ঢুকিয়াই দেখিল, বিবাহবাড়ির উৎসবের সঙ্গে একটা যেন অশান্তির লক্ষণ মিশিয়াছে। দরোয়ানের পাহারা কড়াকড়, বাড়ি হইতে চাকরবাকর কেহ বাহির হইতে পারিতেছে না—সকলেরই মুখে ভয় ও চিন্তার ভাব। হরলাল খবর পাইল কাল রাত্রে বাড়িতে অনেক টাকার গহনা চুরি হইয়া গেছে। দুই তিনজন চাকরকে বিশেষভাবে সন্দেহ করিয়া পুলিসের হাতে সমর্পণ করিবার উদ্যোগ হইতেছে।

হরলাল দোতলায় বারান্দায় গিয়া দেখিল—অধরবাবু আগুন হইয়া বসিয়া আছেন—ও রতিকান্ত তামাক খাইতেছে। হরলাল কহিল—আপনার সঙ্গে গোপনে আমার একটু কথা আছে।

অধরবাবু চটিয়া উঠিয়া কহিলেন, তোমার সঙ্গে গোপনে আলাপ করিবার এখন আমার সময় নয়—যাহা কথা থাকে এইখানেই বলিয়া ফেল।

তিনি ভাবিলেন, হরলাল বুঝি এই সময়ে তাঁহার কাছে সাহায্য বা ধার চাহিতে আসিয়াছে। রতিকান্ত কহিল—আমার সামনে বাবুকে কিছু জানাইতে যদি লজ্জা করেন, আমি না হয় উঠি।

অধর বিরক্ত হইয়া কহিলেন—আঃ বোস না!

হরলাল কহিল—কাল রাত্রে বেণু আমার বাড়িতে এই ব্যাগ রাখিয়া গেছে।

অধর। ব্যাগে কি আছে?

হরলাল ব্যাগ খুলিয়া অধরবাবুর হাতে দিল।

অধর। মাষ্টারে ছাত্রে মিলিয়া বেশ কারবার খুলিয়াছ ত? জানিতে এ চোরাই মাল বিক্রি করিলে ধরা পড়িবে—তাই আনিয়া দিয়াছ—মনে করিতেছ সাধুতার জন্য বক্‌শিস পাইবে?

তখন হরলাল অধরের পত্রখানা তাঁহার হাতে দিল। পড়িয়া তিনি আগুন হইয়া উঠিলেন। বলিলেন,—আমি পুলিশে খবর দিব। আমার ছেলে এখনো সাবালক হয় নাই—তুমি তাহাকে চুরি করিয়া বিলাতে পাঠাইয়াছ। হয়ত পাঁচশো টাকা ধার দিয়া তিন হাজার টাকা লিখাইয়া লইয়াছ। এ ধার আমি শুধিব না!

হরলাল কহিল—আমি ধার দিই নাই।

অধর কহিলেন—তবে সে টাকা পাইল কোথা হইতে! তোমার বাক্স ভাঙ্গিয়া চুরি করিয়াছে?

হরলাল সে প্রশ্নের কোনও উত্তর দিল না। রতিকান্ত টিপিয়া টিপিয়া কহিল—ওঁকে জিজ্ঞাসা করুন না তিন হাজার টাকা কেন, পাঁচশো টাকাও উনি কি কখনো চক্ষে দেখিয়াছেন?

যাহা হউক গহনা চুরির মীমাংসা হওয়ার পরেই বেণুর বিলাত পালানো লইয়া বাড়িতে একটা হুলস্থূল পড়িয়া গেল। হরলাল সমস্ত অপরাধের ভার মাথায় করিয়া লইয়া বাড়ি হইতে বাহির হইয়া আসিল।

রাস্তায় যখন বাহির হইল তখন তাহার মন যেন অসাড় হইয়া গেছে। ভয় করিবার এবং ভাবনা করিবারও শক্তি তখন ছিল

না। এই ব্যাপারের পরিণাম যে কি হইতে পারে মন তাহা চিন্তা করিতেও চাহিল না।

গলিতে প্রবেশ করিয়া দেখিল তাহার বাড়ির সমুখে একটা গাড়ি দাঁড়াইয়া আছে। চমকিয়া উঠিল। হঠাৎ আশা হইল বেণু ফিরিয়া আসিয়াছে। নিশ্চয়ই বেণু! তাহার বিপদ যে সম্পূর্ণ নিরুপায়রূপে চূড়ান্ত হইয়া উঠিবে এ কথা সে কোন মতেই বিশ্বাস করিতে পারিল না।

তাড়াতাড়ি গাড়ির কাছে আসিয়া দেখিল—গাড়ির ভিতরে তাহাদের আপিসের একজন সাহেব বসিয়া আছে। সাহেব হরলালকে দেখিয়াই গাড়ি হইতে নামিয়া তাহার হাত ধরিয়া বাড়িতে প্রবেশ করিল। জিজ্ঞাসা করিল, আজ মফস্বলে গেলে না কেন?

আপিসের দরোয়ান সন্দেহ করিয়া বড় সাহেবকে গিয়া জানাইয়াছে—তিনি ইহাকে পাঠাইয়াছেন।

হরলাল কহিল—তিন হাজার টাকার নোট পাওয়া যাইতেছে না।

সাহেব জিজ্ঞাসা করিল—কোথায় গেল?

হরলাল—"জানি না"—এমন উত্তরও দিতে পারিল না, চুপ করিয়া রহিল।

সাহেব কহিল—টাকা কোথায় আছে দেখিব চল।

হরলাল তাহাকে উপরের ঘরে লইয়া গেল। সাহেব সমস্ত গণিয়া চারিদিক খুঁজিয়া পাতিয়া দেখিল। বাড়ির সমস্ত ঘর তন্ন তন্ন করিয়া অনুসন্ধান করিতে লাগিল। এই সমস্ত ব্যাপার দেখিয়া মা আর থাকিতে পারিলেন না—তিনি সাহেবের সাম্‌নেই বাহির হইয়া ব্যাকুল হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—ওরে হরলাল, কি হইল রে?

হরলাল কহিল—মা, টাকা চুরি গেছে।

মা কহিলেন—চুরি কেমন করিয়া যাইবে? হরলাল এমন সর্ব্বনাশ কে করিল!

হরলাল কহিল—মা, চুপ কর।

সন্ধান শেষ করিয়া সাহেব জিজ্ঞাসা করিল—এ ঘরে রাত্রে কে ছিল?

হরলাল কহিল—দ্বার বন্ধ করিয়া আমি একলা শুইয়াছিলাম—আর কেহ ছিল না।

সাহেব টাকাগুলা গাড়িতে তুলিয়া হরলালকে কহিল—আচ্ছা বড় সাহেবের কাছে চল।

হরলালকে সাহেবের সঙ্গে চলিয়া যাইতে দেখিয়া মা তাহাদের পথ রোধ করিয়া কহিল—সাহেব আমার ছেলেকে কোথায় লইয়া যাইবে? আমি না খাইয়া এ ছেলে মানুষ করিয়াছি—আমার ছেলে কখনই পরের টাকায় হাত দিবে না!

সাহেব বাঙালা কথা কিছু না বুঝিয়া কহিল—আচ্ছা, আচ্ছা!

হরলাল কহিল,—মা তুমি কেন ব্যস্ত হইতেছ? বড় সাহেবের সঙ্গে দেখা করিয়া আমি এখনি আসিতেছি!

মা উদ্বিগ্ন হইয়া কহিলেন—তুই যে সকাল থেকে কিছুই খাস্ নাই।

সে কথার কোনো উত্তর না দিয়া হরলাল গাড়িতে উঠিয়া চলিয়া গেল। মা মেজের উপরে লুটাইয়া পড়িয়া রহিলেন।

বড় সাহেব হরলালকে কহিলেন,—সত্য করিয়া বল ব্যাপারখানা কি?

হরলাল কহিল—আমি টাকা লই নাই।

বড় সাহেব। সে কথা আমি সম্পূর্ণ বিশ্বাস করি। কিন্তু তুমি নিশ্চয় জান কে লইয়াছে ?

হরলাল কোনো উত্তর না দিয়া মুখ নীচু করিয়া বসিয়া রহিল।

সাহেব। তোমার জ্ঞাতসারে এ টাকা কেহ লইয়াছে ?

হরলাল কহিল,—আমার প্রাণ থাকিতে আমার জ্ঞাতসারে এ টাকা কেহ লইতে পারিত না।

বড়সাহেব কহিলেন—দেখ হরলাল, আমি তোমাকে বিশ্বাস করিয়া কোন জামিন না লইয়া এই দায়িত্বের কাজ দিয়াছিলাম। আপিসের সকলেই বিরোধী ছিল। তিন হাজার টাকা কিছুই বেশি নয়। কিন্তু তুমি আমাকে বড় লজ্জাতেই ফেলিবে। আজ সমস্ত দিন তোমাকে সময় দিলাম—যেমন করিয়া পার টাকা সংগ্রহ করিয়া আন—তাহা হইলে এ লইয়া কোন কথা তুলিব না, তুমি যেমন কাজ করিতেছ তেমনি করিবে।

এই বলিয়া সাহেব উঠিয়া গেলেন। তখন বেলা এগারটা হইয়া গেছে। হরলাল যখন মাথা নীচু করিয়া বাহির হইয়া গেল তখন আপিসের বাবুরা অত্যন্ত খুসি হইয়া হরলালের পতন লইয়া আলোচনা করিতে লাগিল।

হরলাল একদিন সময় পাইল। আরও একটা দীর্ঘদিন নৈরাশ্যের শেষতলের পঙ্ক আলোড়ন করিয়া তুলিবার মেয়াদ বাড়িল।

উপায় কি, উপায় কি, উপায় কি—এই ভাবিতে ভাবিতে সেই রৌদ্রে হরলাল রাস্তায় বেড়াইতে লাগিল। শেষে উপায় আছে কি না সে ভাবনা বন্ধ হইয়া গেল কিন্তু বিনা কারণে পথে ঘুরিয়া বেড়ান, থামিল না। যে কলিকাতা হাজার হাজার

লোকের আশ্রয়স্থান তাহাই এক মুহূর্ত্তে হরলালের পক্ষে একটা প্রকাণ্ড ফাঁস-কলের মত হইয়া উঠিল। ইহার কোনও দিকে বাহির হইবার কোনও পথ নাই। সমস্ত জনসমাজ এই অতি ক্ষুদ্র হরলালকে চারিদিকে আটক করিয়া দাঁড়াইয়াছে। কেহ তাহাকে জানেও না, এবং তাহার প্রতি কাহারও মনে কোন বিদ্বেষও নাই, কিন্তু প্রত্যেক লোকেই তাহার শত্রু। অথচ রাস্তার লোক তাহার গা ঘেঁসিয়া তাহার পাশ দিয়া চলিয়াছে। আপিসের বাবুরা বাহিরে আসিয়া ঠোঙায় করিয়া জল খাইতেছেন, তাহার দিকে কেহ তাকাইতেছেন না; ময়দানের ধারে অলস পথিক মাথার নীচে হাত রাখিয়া একটা পায়ের উপর আর একটা পা তুলিয়া গাছের তলায় পড়িয়া আছে; স্যাকরাগাড়ি ভর্ত্তি করিয়া হিন্দুস্থানী মেয়েরা কালীঘাটে চলিয়াছে; একজন চাপরাসি একখানা চিঠি লইয়া হরলালের সম্মুখে ধরিয়া কহিল, বাবু ঠিকানা পড়িয়া দাও,—যেন তাহার সঙ্গে অন্য পথিকের কোন প্রভেদ নাই, সেও ঠিকানা পড়িয়া তাহাকে বুঝাইয়া দিল। ক্রমে আপিস বন্ধ হইবার সময় আসিল। বাড়িমুখো গাড়িগুলো আপিসমহলের নানা রাস্তা দিয়া ছুটিয়া বাহির হইতে লাগিল। আপিসের বাবুরা ট্র্যাম ভর্ত্তি করিয়া থিয়েটারের বিজ্ঞাপন পড়িতে পড়িতে বাসায় ফিরিয়া চলিল। আজ হইতে হরলালের আপিস নাই, আপিসের ছুটি নাই, বাসায় ফিরিয়া যাইবার জন্য ট্র্যাম ধরিবার কোন তাড়া নাই। সহরের সমস্ত কাজকর্ম্ম, বাড়িঘর, গাড়িজুড়ি, আনাগোনা হরলালের কাছে কখন বা অত্যন্ত উৎকট সত্যের মত দাঁত মেলিয়া উঠিতেছে কখন বা একবারে বস্তুহীন স্বপ্নের মত ছায়া হইয়া আসিতেছে। আহার নাই, বিশ্রাম নাই,

আশ্রয় নাই, কেমন করিয়া যে হরলালের দিন কাটিয়া গেল তাহ সে জানিতেও পারিল না। রাস্তায় রাস্তায় গ্যাসের আলো জ্বলিল—যেন একটা সতর্ক অন্ধকার দিকে দিকে তাহার সহস্র ক্রূর চক্ষু মেলিয়া শিকারলুব্ধ দানবের মত চুপ করিয়া রহিল। রাত্রি কত হইল সে কথা হরলাল চিন্তাও করিল না। তাহার কপালের শিরা দব্‌দব্‌ করিতেছে; মাথা যেন ফাটিয়া যাইতেছে; সমস্ত শরীরে আগুন জ্বলিতেছে; পা আর চলে না। সমস্ত দিন পর্য্যায়ক্রমে বেদনার উত্তেজনা ও অবসাদের অসাড়তার মধ্যে মার কথা কেবল মনের মধ্যে যাতায়াত করিয়াছে—কলিকাতার অসংখ্য জনশ্রেণীর মধ্যে কেবল ঐ একটি মাত্র নামই শুষ্ককণ্ঠ ভেদ করিয়া মুখে উঠিয়াছে—মা, মা, মা। আর কাহাকেও ডাকিবার নাই। মনে করিল, রাত্রি যখন নিবিড় হইয়া আসিবে, কোন লোকই যখন এই অতি সামান্য হরলালকে বিনা অপরাধে অপমান করিবার জন্য জাগিয়া থাকিবে না, তখন সে চুপ করিয়া তাহার মায়ের কোলের কাছে গিয়া শুইয়া পড়িবে—তাহার পরে ঘুম যেন আর না ভাঙে! পাছে তার মার সম্মুখে পুলিসের লোক বা আর কেহ তাহাকে অপমান করিতে আসে এই ভয়ে সে বাসায় যাইতে পারিতেছিল না। শরীরের ভার যখন আর বহিতে পারে না এমন সময় হরলাল একটা ভাড়াটে গাড়ি দেখিয়া তাহাকে ডাকিল। গাড়োয়ান জিজ্ঞাসা করিল,—"কোথায় যাইবে?"

হরলাল কহিল "কোথাও না। এই ময়দানের রাস্তায় খানিকক্ষণ হাওয়া খাইয়া বেড়াইব।"

গাড়োয়ান সন্দেহ করিয়া চলিয়া যাইবার উপক্রম করিতেই হরলাল তাহার হাতে আগাম ভাড়া একটা টাকা দিল। সে

গাড়ি তখন হরলালকে লইয়া ময়দানের রাস্তায় ঘুরিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল।

তখন শ্রান্ত হরলাল তাহার তপ্ত মাথা খোলা জানলার উপর রাখিয়া চোখ বুজিল। একটু একটু করিয়া তাহার সমস্ত বেদনা যেন দূর হইয়া আসিল। শরীর শীতল হইল। মনের মধ্যে একটি সুগভীর সুনিবিড় আনন্দপূর্ণ শান্তি ঘনাইয়া আসিতে লাগিল। একটা যেন পরম পরিত্রাণ তাহাকে চারিদিক হইতে আলিঙ্গন করিয়া ধরিল। সে যে সমস্ত দিন মনে করিয়াছিল কোথাও তাহার কোনো পথ নাই, সহায় নাই নিষ্কৃতি নাই, তাহার অপমানের শেষ নাই, দুঃখের অবধি নাই, সে কথাটা যেন এক মুহূর্তেই মিথ্যা হইয়া গেল। এখন মনে হইল, সে ত একটা ভয় মাত্র, সে ত সত্য নয়। যাহা তাহার জীবনকে লোহার মুঠিতে আঁটিয়া পিষিয়া ধরিয়াছিল, হরলাল তাহাকে আর কিছুমাত্র স্বীকার করিল না;—মুক্তি অনন্ত আকাশ পূর্ণ করিয়া আছে, শান্তির কোথাও সীমা নাই। এই অতি সামান্য হরলালকে বেদনার মধ্যে অপমানের মধ্যে অন্যায়ের মধ্যে বন্দী করিয়া রাখিতে পারে এমন শক্তি বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের কোনো রাজা মহারাজারও নাই। যে আতঙ্কে সে আপনাকে আপনি বাঁধিয়াছিল তাহা সমস্তই খুলিয়া গেল। তখন হরলাল আপনার বন্ধনমুক্ত হৃদয়ের চারিদিকে অনন্ত আকাশের মধ্যে অনুভব করিতে লাগিল, যেন তাহার সেই দরিদ্র মা দেখিতে দেখিতে বাড়িতে বাড়িতে বিরাটরূপে সমস্ত অন্ধকার জুড়িয়া বসিতেছেন। তাঁহাকে কোথাও ধরিতেছে না। কলিকাতার রাস্তা-ঘাট বাড়ি-ঘর দোকান-বাজার একটু একটু করিয়া তাঁহার মধ্যে আচ্ছন্ন হইয়া লুপ্ত হইয়া

যাইতেছে—বাতাস ভরিয়া গেল, আকাশ ভরিয়া উঠিল, একটি একটি করিয়া নক্ষত্র তাঁহার মধ্যে মিলাইয়া গেল,—হরলালের শরীর মনের সমস্ত বেদনা, সমস্ত ভাবনা, সমস্ত চেতনা তাঁহার মধ্যে অল্প অল্প করিয়া নিঃশেষ হইয়া গেল,—ঐ গেল, তপ্ত বাষ্পের বুদ্বুদ একেবারে ফাটিয়া গেল—এখন আর অন্ধকারও নাই, আলোকও নাই, রহিল কেবল একটি প্রগাঢ় পরিপূর্ণতা।

গির্জ্জার ঘড়িতে একটা বাজিল। গাড়োয়ান অন্ধকার ময়দানের মধ্যে গাড়ি লইয়া ঘুরিতে ঘুরিতে অবশেষে বিরক্ত হইয়া কহিল—বাবু ঘোড়া ত আর চলিতে পারে না—কোথায় যাইতে হইবে বল।

কোনো উত্তর পাইল না। কোচ্‌বাক্স হইতে নামিয়া হরলালকে নাড়া দিয়া আবার জিজ্ঞাসা করিল। উত্তর নাই। তখন ভয় পাইয়া গাড়োয়ান পরীক্ষা করিয়া দেখিল হরলালের শরীর আড়ষ্ট, তাহার নিশ্বাস বহিতেছে না।

"কোথায় যাইতে হইবে" হরলালের কাছ হইতে এই প্রশ্নের আর উত্তর পাওয়া গেল না।